বারো মাসের কৃষি

মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন

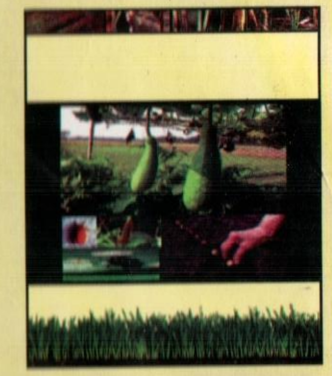

রা বছর জুড়েই বাংলার কৃষিতে ঘটে নানা
র্মকাণ্ড। কৃষকের গায়ের নোনা ঘামের
নিময়ে বাংলার মাঠে হেঁসে ওঠে সোনালী
সল। হঠাৎ বন্যা, খরা, ঝড়-জলোচ্ছাসসহ
ভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেড়ে নেয় এ হাঁসি।
 সাথে বিভিন্ন রোগ ও পোকার আক্রমণে
শেহারা হয়ে ওঠে আমাদের কৃষক।
ময়মতো মাঠে করণীয় কাজগুলো যদি আগে
থকে জানা থাকে তবে সাবধান হওয়া যায় খুব
হজেই। বাঁচা যায় ক্ষতির হাত থেকে। বৃহত্তর
ষির ভুবনে প্রধান প্রধান ফসলের করণীয়
াজগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলা মাস
নুযায়ী তুলে ধরা হয়েছে বারো মাসের কৃষি
ইটিতে। পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে
ভিযোজিত কৃষির আধুনিক প্রযুক্তিগুলো মাঠে
য়োগের কর্ম পরিকল্পনা তৈরিতে কৃষকের
হায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করবে এ বইটি।
াশা করি বইটি কৃষকসহ সকল পাঠকদের
উপকারে আসবে।

প্রচ্ছদ ▪ অরূপ মান্দী

বারো মাসের কৃষি

মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন

প্রান্ত প্রকাশন

প্রথম বর্ধিত সংস্করণ: বইমেলা-২০২০
প্রথম প্রকাশ: বইমেলা-২০১৬

বারো মাসের কৃষি
মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন
প্রকাশক
মো. আমিনুর রহমান
প্রান্ত প্রকাশন
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ই-মেইল: prantoprokashon@gmail.com
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
অরূপ মান্দী
মুদ্রণ
মো. আমিনুর রহমান কর্তৃক প্রান্ত প্রকাশন থেকে
প্রকাশিত এবং মা অফসেট প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
বর্ণ বিন্যাস
বৃত্ত কম্পিউটার সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মূল্য ঃ ২০০.০০ মাত্র

BARO MASHER KRISHI
Written by: Mohammad Manjur Hossain
Published by: Pranto Prokashon
36 Banglabazar, Dhaka-1100.
Price: 200.00 Only.

ISBN: 978-984-91320-5-9

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা
"মরহুম আব্দুল শুক্কুর"

প্রথম এখন হাজীর উদ্দীন মেমোরিয়াল পাঠাগারে আমার এই বইটি ভিত্তিপ্রথম আকারে সংরক্ষণ করা হলে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করবো।

৭.৫.2023

মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন
বিসিএস (কৃষি), পরিচিতি নং-২২৮৪
উপপরিচালক (গণযোগাযোগ)
কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা।

মুখবন্ধ

এগিয়ে চলার গল্পটা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। বড় হচ্ছে ক্যানভাস। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া সবখানে। বদলে যাওয়া চিত্রটি চোখে পড়ার মতো। এ যেন এক অন্যরকম বাংলাদেশ! চরম দারিদ্র্য থেকে ঘুরে দাঁড়ানো বাংলাদেশ। নগরায়ন শহর ছেড়ে এখন গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। কমছে চাষাবাদযোগ্য জমি। কিন্তু বাড়ছে কৃষি উৎপাদন। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলেই এমনটি ঘটছে।

কৃষির যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ, তার সাথে এদেশের মানুষের নিবিড় সম্পর্ক আজন্ম। ক্ষেত খামারের উপার্জিত আয়েই উন্নয়ন পথের সূচনা; এখন তা গোটা বিশ্বময়। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে বাংলার গ্রামীণ মানুষের পা পড়েনি। ধান, গম, আলু, পাট কিংবা সবজি বিক্রির অর্থে এখনো চলে অনেকের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি এখনও কৃষিনির্ভর। শুধু তাই নয়, যে মানুষগুলো জীবিকার প্রয়োজনে প্রবাস জীবন বেছে নিয়েছেন তাদের পাঠানো রেমিটেন্সের বড় অংশ বিনিয়োগ হচ্ছে কৃষি জমি ক্রয়ে কিংবা বাড়িঘর উন্নয়নে। গার্মেন্টসসহ নানা শিল্প কারখানায় লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করছে। এ সাধারণ কর্মজীবীদের উপার্জিত অর্থ যাচ্ছে গ্রামে, বিনিয়োগ হচ্ছে কৃষিতে। শহুরে শিক্ষিত শ্রেণিও এখন যুক্ত হচ্ছে কৃষি কর্মকাণ্ডে। বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে।

কৃষিক্ষেত্রের বৈপ্লবিক উন্নয়নে এদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিএডিসি, বিএআরসি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান অতুলনীয়। কৃষি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে প্রচার প্রসারে কৃষি তথ্য সার্ভিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে কৃষি কাজে এখনও বাংলা সনের ক্যালেন্ডার ব্যবহার হয়। মূলত এ বিষয়টি মাথায় রেখে রচিত হয়েছে 'বারো মাসের কৃষি' বইটি। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে বাংলা মাসওয়ারি কৃষি কাজ বা ফসল উৎপাদনের কথা। ফসল ও শাকসবজি চাষ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। আলোকপাত করা হয়েছে রবি, খরিফ-১ ও খরিফ-২ মৌসুম অনুযায়ী ফসল বা শস্য বিন্যাস।

এ বইয়ে বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বাংলার মাঠে কৃষি কাজের একটি চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। মাঠে যে ফসলটি থাকবে কিংবা বসতবাড়িতে যে শাকসবজি আছে, তার যত্ন কীভাবে নিতে হবে, সার ও পানি কখন দিতে হবে সবকিছুরই তথ্য এখানে সংকলিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে।

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ। বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চরম ক্ষতি হচ্ছে কৃষির। পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজিত কৃষি প্রযুক্তিগুলো মাঠে প্রয়োগের মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। এ সংগ্রামে জয়ী হতেই হবে। এ জয়ে কিছুটা সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য নিয়েই লেখা হয়েছে বইটি।

দেশের অন্যতম কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন 'কৃষিকথা'। ছিয়াত্তর বছর ধরে ম্যাগাজিনটি কৃষির আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে চলেছে কৃষকের দোরগোড়ায়। এটি'র প্রকাশনার দায়িত্বে রয়েছে কৃষি তথ্য সার্ভিস। কৃষিকথা'য় নিয়মিত প্রকাশিত হয় 'আগামি মাসের কৃষি'। প্রকাশিত সে লেখাগুলোরই সংকলন হচ্ছে 'বারো মাসের কৃষি'। কৃতজ্ঞতা কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান এবং কৃষিকথা'র সাবেক সহকারী সম্পাদক মো. মতিয়ার রহমানকে যাদের প্রেরণায় লেখাগুলো ছাপার অক্ষরে মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

ধন্যবাদ কৃষি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম স্যারকে, যিনি সবসময়ই উৎসাহ দিয়েছেন। এছাড়া সহকর্মী তৌফিক আরেফিন, সাইফুদ্দিন সবুজ, মারুফ মাসুম, জাকির হাসনাৎ, গোলাম মাওলার সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতেই হয়। কৃতজ্ঞতা বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাছে যাদের প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই সমৃদ্ধ হয়েছে এ বইয়ের তথ্যভাণ্ডার। প্রান্ত প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী মো. আমিনুর রহমান এ বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আর পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতাতো ছিল সব সময়।

বইটি কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষের সামান্য উপকারে আসলে সার্থক হবে আমাদের শ্রমের। সময় স্বল্পতার কারণে বইটিতে তথ্যের স্বল্পতা ও কিছু ভুল থেকে যেতে পারে। অনিচ্ছাকৃত এ ভুলেগুলো আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এ বইটির মান উন্নয়নে আপনাদের গঠনমূলক পরামর্শ বা সমালোচনা গ্রহণ করা হবে কৃতজ্ঞ চিত্তে। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠা বাংলার কৃষিকে নিয়ে যাবে সাফল্যের শীর্ষে।

বর্তমান সংস্করণে বর্ধিত কলেবরে কিছু চাষপদ্ধতি সংযোজন করা হয়েছে। যেগুলো থেকে চাষীরা উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি।

–মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন

সূচিপত্র

শাকসবজি চাষের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১১
দেশিয় সবজিতে খাদ্যের পুষ্টিমান ১২
বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ১৩

বৈশাখ মাসের কৃষি .... (১৫-৩৬)
- চাষ উপযোগী শাক্সবজি: ১৫
- বোরো ধান ১৫
- গম ও ভুট্টা ১৭
- পাট ১৭
- শাক্সবজি ১৮
- ধানের চাষপদ্ধতি ১৯
- পুঁইশাকের চাষপদ্ধতি ২২
- ঢেঁড়সের চাষপদ্ধতি ২৪
- বেগুনের চাষপদ্ধতি ২৭
- পটলের চাষপদ্ধতি ৩৩

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষি .... (৩৭-৪৭)
- বোরো ধান ৩৭
- বোনা আউশ ৩৭
- আমন ধান ৩৮
- পাট ৩৯
- শাক্সবজি ৪০
- করলার চাষপদ্ধতি ৪১
- জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবিধ ৪৭

আষাঢ় মাসের কৃষি .... (৪৮-৫৯)
- আউশ ধান ৪৮
- আমন ধান ৪৯
- পাট ৪৯
- ভুট্টা ৫০
- শাক্সবজি ৫০
- চিচিঙ্গার চাষপদ্ধতি ৫১
- ঝিঙ্গের চাষপদ্ধতি ৫৩
- শসার চাষ পদ্ধতি ৫৬

শ্রাবণ মাসের কৃষি .... (৬০-৬৬)
আউশ ৬০
আমন ধান ৬০
পাট ৬১
শাক্‌সবজি ৬২
গাছপালা ৬৩
কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরির পদ্ধতিঃ ৬৩

ভাদ্র মাসের কৃষি .... (৬৭-৭৫)
আমন ধান ৬৭
পাট ৬৮
আখ ৬৮
তুলা ৬৯
শাক্‌সবজি ৬৯
লাউ-এর চাষপদ্ধতি ৭০
শিমের চাষপদ্ধতি ৭৩

আশ্বিন মাসের কৃষি .... (৭৬-৮৮)
আমন ধান ৭৬
আখ ৭৭
বিনা চাষে ফসল আবাদ ৭৭
শাক্‌সবজি ৭৭
লালশাকের চাষপদ্ধতি ৭৮
পালংশাকের চাষপদ্ধতি ৮০
ফুলকপির চাষপদ্ধতি ৮২
ওলকপির চাষপদ্ধতি ৮৪
টমেটোর চাষপদ্ধতি ৮৬

কার্তিক মাসের কৃষি .... (৮৯-১০৭)
আমন ধান ৮৯
গম ৮৯
আখ ৯০
ভুট্টা ৯০
সরিষা ও অন্যান্য তেল ফসল ৯০
আলু ৯০
মিষ্টি আলু ৯১
ডাল ফসল ৯১
মাসকালাইয়ের চাষপদ্ধতি ৯২
মুগের চাষপদ্ধতি ৯৪
মসুরের চাষপদ্ধতি ৯৭
শালগমের চাষপদ্ধতি ১০০
বাটিশাক/চীনাশাকের চাষ পদ্ধতি ১০২
গাজরের চাষপদ্ধতি ১০৩
বাঁধাকপির চাষপদ্ধতি ১০৫

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষি .... (১০৮-১৩০)
আমন ধান ১০৮
বোরো ধান ১০৮
গম ১০৯
ভুট্টা ১১০
সরিষা ও অন্যান্য তেল ফসল ১১১
আলু ১১১
ডাল ফসল ১১১
শাক্‌সবজি ১১২
মূলোর চাষ পদ্ধতি ১১২
পেঁয়াজের চাষপদ্ধতি ১১৫
রসুনের চাষপদ্ধতি ১২১
মরিচের চাষ পদ্ধতি ১২৪
গাছপালা ১৩০

পৌষ মাসের কৃষি .... (১৩১-১৩৫)
বোরো ধান ১৩১
গম ১৩২
ভুট্টা ১৩২
আলু ১৩২
তুলা ১৩৩
ডাল ও তেল ফসল ১৩৪
শাক্‌সবজি ১৩৪
গাছপালা ১৩৫

মাঘ মাসের কৃষি .... (১৩৬-১৩৯)
বোরো ধান ১৩৬
গম.. ১৩৭
ভুট্টা.. ১৩৭
আলু ১৩৭
তুলা ১৩৮
ডাল ও তেল ফসল.. ১৩৮
শাকসবজি ১৩৮
গাছপালা.. ১৩৯
ফাল্গুন মাসের কৃষি.. (১৪০-১৪৮)
বোরো ধান ১৪০
বৃষ্টিনির্ভর আউশ.. ১৪১
গম ১৪১
ভুট্টা ১৪১
পাট ১৪১
শাকসবজি ১৪২
কলমীশাকের চাষপদ্ধতি.. ১৪২
মিষ্টি কুমড়োর চাষপদ্ধতি ১৪৪
চৈত্র মাসের কৃষি.. (১৪৯-১৫৯)
বোরো ধান ১৪৯
আউশ ধান ১৫০
গম ১৫১
ভুট্টা (রবি).. ১৫১
ভুট্টা (খরিপ) ১৫১
পাট.. ১৫২
অন্যান্য মাঠ ফসল.. ১৫২
শাক্সবজি.. ১৫৩
ওলকচুর চাষপদ্ধতি.. ১৫৩
কাঁকরোলের চাষপদ্ধতি.. ১৫৫
গাছপালা.. ১৫৯

শাকসবজি চাষের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

শাকসবজি আমাদের ক্ষুধা নিবারণ, দেহের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন এবং শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও শাকসবজি একটি অত্যাবশ্যক ও প্রয়োজনীয় খাদ্য। শাকসবজিতে কিছু প্রোটিন, খনিজ পদার্থ, যথেষ্ট পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিনজাতীয় উপাদান পাওয়া যায়। একমাত্র ভিটামিন 'ডি' ছাড়া অন্যান্য ভিটামিন যেমন- 'এ', 'বি', 'সি', 'ই' এবং 'জি' প্রায় সব টাটকা শাকসবজিতে কমবেশি পাওয়া যায়। এ ছাড়া শরীরের রক্তবর্ধক লৌহ, আয়োডিন ও খনিজ পদার্থ এবং ক্যালসিয়ামও থাকে শাকসবজিতে। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড়ের পুষ্টি সাধন করে এবং আয়োডিন গলগণ্ড রোগ প্রতিরোধ করে। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে শাক খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না, পেট পরিষ্কার থাকে, ফলে অসুখ-বিসুখ কম হয়। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের দৈনিক প্রায় ২৫০-৩০০ গ্রাম সবজি খাওয়া উচিত। কিন্তু সে তুলনায় আমরা পাই মাত্র ৩১ গ্রামের মতো। উন্নত বিশ্বের জনগণ মাথাপিছু দৈনিক ৩০০-৫০০ গ্রাম শাকসবজি খেয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, জাপানে মাথাপিছু সবজি প্রাপ্যতার পরিমাণ ৩৪৮ গ্রাম।

আমাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য প্রতিদিন শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৫ লাখ শিশু রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। একই কারণে এ দেশে প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি শিশু অন্ধ হয়ে যায়।

সবজিতে ক্যান্সার প্রতিরোধী গুণাবলি আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ঘোষণা দিয়েছে, যে যত বেশি সবজি ও ফল খায় ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তার তত কম। এ ছাড়া অন্যান্য রোগবালাই থেকে বাঁচতে প্রতিদিন প্রচুর শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন, এতে চর্মরোগ, স্কার্ভি, মুখে ঘা, রিকেট, রক্তশূন্যতা এসব অনেক রোগ থেকে বাঁচা যায়। এ ছাড়া এসব রোগ থেকে বাঁচতে যখন শিশুর বয়স পাঁচ-ছয় মাস হয় তখন থেকে প্রতিদিন পরিমাণ মতো গাঢ় সবুজ ও রঙিন শাকসবজি শিশুকে খাওয়ানো উচিত। একমাত্র শাকসবজিতে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, নিরামিষভোজীরা দীর্ঘজীবী হয়ে থাকে। তাই আমাদের শাকসবজি আবাদ, উৎপাদন ও ব্যবহার অবশ্যই বাড়াতে হবে। অপরদিকে শাকসবজি চাষের জন্য খুব বেশি জমির দরকার হয় না। স্বল্পকালস্থায়ী ফসল হলে একই জমিতে বছরে ৩-৪ বার শাকসবজি উৎপাদন করা যায়। আমাদের দেশের আবহাওয়া ও মাটি শাকসবজি উৎপাদনের জন্য সারাবছর বিশেষ উপযোগী। উন্নত পদ্ধতিতে উৎকৃষ্ট জাতের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শাকসবজি চাষ করে

আমাদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে সবজি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও রফতানি করে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার বিরাট সুযোগ রয়েছে আমাদের।

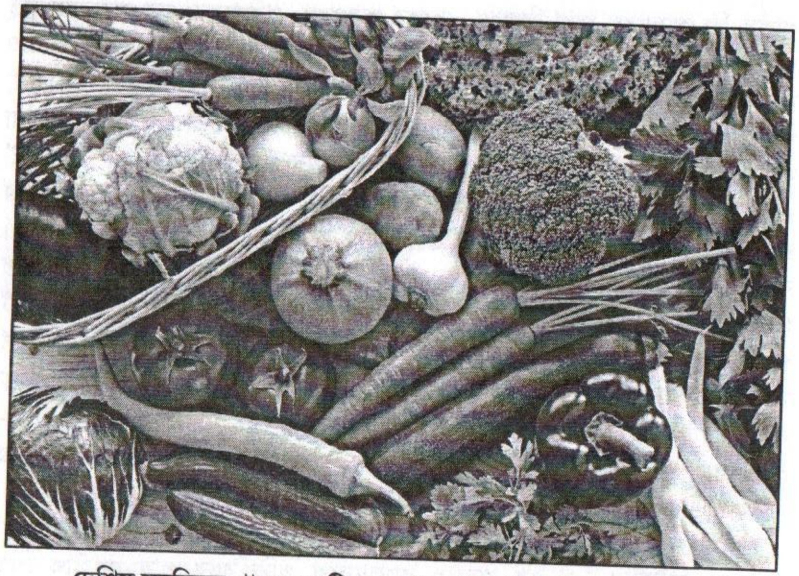

দেশিয় সবজিতে খাদ্যের পুষ্টিমান (খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

সবজির নাম	খাদ্য শক্তি (কিলোক্যালরি)	আমিষ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটামিন বি-১ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি-২ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
লালশাক	৪৩.০০	৫.৩০	৫.০০	৩৭৪.০০	-	১১৯৪০.০০	০.১০	০.১৩	৪৩.০০
কলমিশাক	৪৬.০০	১.৮০	৯৪.০০	১০৭.০০	৩.৯০	১০৭৪০.০০	০.১৪	০.৪৩	৪২.০০
পুঁইশাক	২৭.০০	২.২০	৪.২০	১৬৪.০০	১০.০০	১২৭৫০.০০	০.০২	০.৩৬	৬৪.০০
পাটশাক	৬২.০০	২.৬০	১২.৬০	১৩৩.০০	-	১১৭০০.০০	০.১০	০.০৯	অল্প
মুলাশাক	২৪.০০	১.৭০	২.৩০	২৮.০০	৩.৬০	৯৭০০.০০	০.০৪	০.০৯	১৪৮.০০
পালংশাক	৩০.০০	৩.৩০	৪.০০	৯৮.০০	১০.০০	৮৪৭০.০০	০.০৩	০.০৯	৯৭.০০
বাঁধাকপি	২৬.০০	১.৩০	৪.৭০	৩১.০০	০.৮০	-	০.০৬	০.০৫	৩.০০
ফুলকপি	৪১.০০	২.৬০	৭.৫০	৪১.০০	১.৫০	-	০.০২৭	০.০৩	৯১.০০
বেগুন	৪২.০০	১.৮০	২.২০	২৮.০০	০.৯০	৮৫০.০০	০.১২	০.০৮	৫.০০
ঝিঙা	৩০.০০	১.৮০	৪.৩০	১৬.০০	০.৫০	৬.৭০	০.১১	০.০৩	৩.০০
কাঁকরোল	৮০.০০	২.১০	১৭.৪০	৩৬.০০	-	৪১০.০০	০.০৮	০.০৬	-
ঢেঁড়স	৪৩.০০	১.৮০	৮.৭০	১১৬.০০	১.৫০	১৬৭০.০০	০.০৪	০.১৬	১০.০০
পটোল	৩১.০০	২.৪০	৪.১০	২০.০০	১.৭০	৭৯০.০০	০.৩০	০.০৩	২.০০
শিম	৩৮.০০	৩.৯০	৫.৪০	২৮.০০	২.৬০	২৫৪০.০০	০.০৫	০.০১	২.০০
করলা	২৮.০০	২.৫০	৪.৩০	১৪.০০	১.৮০	১৪৫০.০০	০.০৪	০.০২	৬৮.০০
লাউ	৬৬.০০	১.১০	১৫.১০	২৬.০০	০.৭০	-	০.০১	০.২০	৪.০০
শসা	২২.০০	১.৬০	৩.৫০	১৪.০০	১.৫০	অল্প	০.১৬	০.০২	৫.০০
কচু	১১৬.০০	৩.০০	২৪.৪০	৪০.০০	১.৭০	-	০.১৬	০.১১	৬.০০

বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ

কৃষক পর্যায়ে এ ফাঁদ যাদুর বাক্স হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি আমাদের দেশে পরিবেশবান্ধব কৃষিপ্রযুক্তি হিসেবে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে ফেরোমোন ফাঁদ নামে একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি সবজি উৎপাদন হয়। নিত্যনতুন লাগসই প্রযুক্তি ও কৃষি উপকরণসমূহের যথাযথ ব্যবহারই এনে দিতে পারে কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ। কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহারের অভাবে ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং পরিবেশগত বিপর্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদিত সবজির মধ্যে বেগুন ও টমেটো খুবই জনপ্রিয় সবজি। বেগুনের ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা ও টমেটোর ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণে ফলন ও বাজারমূল্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। অন্যদিকে কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা ও ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে।

যেসব পোকা দমনে সেক্স ফেরোমোন ব্যবহার করা যাবে তাহলো-

বেগুনের ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা দমনে, টমেটোর ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে এবং কুমড়া জাতীয় ফসলের (লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, ক্ষিরা, শসা, করলা, কাঁকরোল, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, উচ্ছে, ধুন্দল, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি) মাছি পোকা দমনের জন্য এ ফাঁদ অত্যন্ত কার্যকরী।

মাছি পোকা দ্বারা ক্ষতির প্রকৃতিঃ

মাছি পোকার আক্রমণে প্রায় ৫০-৭০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে যায়, যা কীটনাশক ব্যবহার করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এ পোকা প্রথমে ফলের ভিতরে ডিম পাড়ে এবং পরবর্তীতে ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের ভিতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। মাছি পোকার কীড়ার দ্বারা আক্রান্ত ফল দ্রুত পচে যায় এবং মাটিতে ঝরে পড়ে। লুকিয়ে থাকা পরিপূর্ণ কীড়া অল্পসময়েই পুত্তলি ও পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়ে নতুনভাবে আক্রমণ শুরু করে।

সেক্স ফেরোমোন পদ্ধতির উপকারিতাঃ

* এটি একটি সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি।

* কম খরচে এবং কম সময়ে ক্ষতিকর পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
* স্থানীয় উপকরণ দিয়ে এই ফাঁদ তৈরি করা যায়।
* এ প্রযুক্তির ব্যবহারে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ তৈরির উপকরণসমূহঃ

* একটি ফাঁদ (কৃষক পর্যায়ে যাকে যাদুর বাক্স বলে)।
* সেক্স ফেরোমোন টোপ/লিউর/কিউ লিউর (কৃষক পর্যায়ে তাবিজ বলে)
* মাঠে স্থাপনের জন্য দুটি খুঁটির দরকার হয়।
* পানি ও ডিটার্জেন্ট পাউডার বা সাবান প্রয়োজন।

ফেরোমোন ফাঁদ তৈরি ও স্থাপন পদ্ধতিঃ

* প্রায় তিন লিটার পানিধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্লাস্টিকের বৈয়ম বা পাত্র নিতে হবে। বৈয়মের উভয় পাশে ৪-৫ ইঞ্চি উপরে ৪-৫ ইঞ্চি চওড়া করে ত্রিভূজাকারে কেটে নিতে হবে। বৈয়মের তলায় কাটা অংশের নিচে কমপক্ষে ২-৩ ইঞ্চি সাবান বা ডিটার্জেন্ট পাউডার মিশ্রিত পানি দিয়ে ভরে রাখতে হবে। অথবা বাজার থেকে তৈরি করা ফাঁদ কিনে ব্যবহার করতে হবে।
* বৈয়মের ঢাকনার মধ্যখানে ছিদ্র করে তার বা সুতা দিয়ে টোপ বা তাবিজটি সাবান মিশ্রিত পানি থেকে ২-৩ ইঞ্চি উপরে ঝুলিয়ে দিতে হবে। তবে বাজার থেকে কেনা বৈয়মের ঢাকনায় ছিদ্র করা থাকে সেখানে টোপ বা তাবিজটি ত্রিকোণাকারভাবে কাঁটা অংশের মাঝ বরাবর তার দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হবে।
* গাছের সম উচ্চতায় ফেরোমোন ফাঁদটি দুটি খুঁটির সাহায্যে শক্তভাবে বেঁধে দিতে হবে।
* কাঁটা অংশ উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে ঝুলাতে হবে।

ফেরোমোন ফাঁদ মাঠে স্থাপনের সময়ঃ

চারা লাগানোর ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে জমিতে ফাঁদ লাগাতে হবে।

প্রয়োগ মাত্রাঃ

* জমিতে ১০-১২ মিটার পর পর বর্গাকারে ফেরোমোন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে।
* প্রতি ২.৫ শতাংশ জমির জন্য একটি করে ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
* একটি টোপ বা তাবিজ দুই মাস পর্যন্ত কার্যকরী থাকে।

সাবধানতাঃ

* সাবান পানি বা বৃষ্টির পানিতে টোপ বা তাবিজটি ভিজে গেলে তা পরিবর্তন করে দিতে হবে।
* প্যাকেট কাটা হলে প্যাকেটে থাকা সব টোপ বা তাবিজ ব্যবহার করতে হবে।
* তিন থেকে পাঁচ দিন পর পর সাবান মিশ্রিত পানি পরিবর্তন করতে হবে।
* সপ্তাহে কমপক্ষে দুই দিন ফাঁদের পানি পরীক্ষা করে মরে থাকা পোকাগুলো পানি থেকে আঙুল অথবা কাঠি দিয়ে সরিয়ে ফেলতে হবে।
* গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে ফাঁদটিকেও ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে তুলে দিতে হবে।

বৈশাখ মাসের কৃষি

(এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি)

বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথম মাস অর্থাৎ আর একটি নতুন বছরের সুচনা। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছি বার মাসের কৃষি। গত বছরের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, কষ্ট, অসফলতা সব দূর করে আমাদের প্রত্যাশা নতুন বছরটি যেন সবার জীবনে হাসি, আনন্দ, সফলতা, উচ্ছ্বাস আর সমৃদ্ধি বয়ে আনে। আমাদের গ্রামগঞ্জে বৈশাখ মাসে চলতে থাকে ঐতিহ্যবাহী মেলা, পার্বন, উৎসব, আদর, আপ্যায়ন। নতুন আবাহান আর প্রত্যাশার মাঝে সুজন কৃষক ফিরে তাকায় দিগন্তের মাঠে। প্রিয় পাঠক আসুন এক পলকে জেনে নেই বৈশাখে কৃষির করণীয় দিকগুলো।

চাষ উপযোগী শাকসবজিঃ

গিমাকলমি, ডাঁটা, পাতাপেঁয়াজ, বেগুন, মরিচ, আদা, লালশাক, পাটশাক, হলুদ, ঢেঁড়সের বীজ বপন ও গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণ করা যায়। মিষ্টিকুমড়া, করলা, ধুন্দুল, ঝিঙ্গা, চিচিংগা, চালকুমড়া, শসার মাচা তৈরি, চারা উৎপাদন, কুমড়া জাতীয় সবজির পোকামাকড় দমন, সেচ প্রদান। খরিফ-১ সবজির বীজ বপন, চারা রোপণ। লালশাক, পুঁইশাক, ডাঁটা, বরবটি ফসল সংগ্রহ। খরিফ-২ সবজির বেড প্রস্তত ও চারা তৈরি ইত্যাদি। ফল চাষের স্থান নির্বাচন, উন্নতজাতের ফলের চারা/কলম সংগ্রহ, পুরোনো ফলগাছে সুষম সার প্রয়োগ, ফলন্ত গাছে সেচ প্রদান। সবজি হিসেবে কাঁচা কাঁঠালের ব্যবহার। কচি সজিনা, তরমুজ, বাঙ্গি সংগ্রহ, আলুর চিপস তৈরি ও রকমারি ব্যবহার।

বোরো ধান

যারা দেরিতে বোরো ধানের চারা রোপণ করেছেন তাদের জমিতে চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। তবে কেউ যদি দানাদার ইউরিয়ার পরিবর্তে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করে থাকেন তবে ইউরিয়ার উপরি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। জমিতে আগাছা পরিষ্কার করা, সেচ দেয়া, বালাই দমন এসব কাজ সঠিকভাবে করতে হবে। থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। আবার ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে।

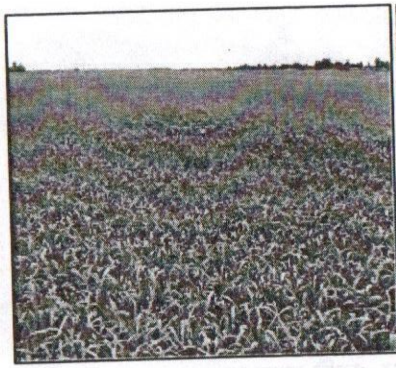
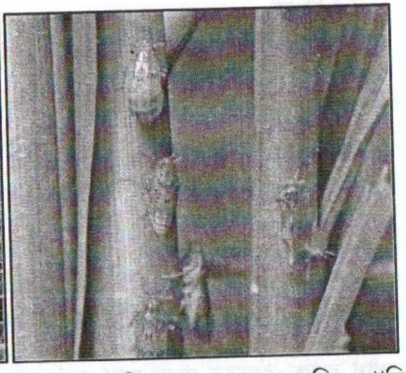

এ মাসে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধি পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকার আক্রমণ রোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আলোর ফাঁদ পেতে, পোকা ধরার জাল ব্যবহার করে, ক্ষতিকর পোকার ডিমের গাদা নষ্ট করে, উপকারি পোকা সংরক্ষণ করে, ক্ষেতে ডাল-পালা পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ধানক্ষেত বালাইমুক্ত করা দরকার। এসব উপায়ে পোকার আক্রমন প্রতিহত করা না গেলে শেষ উপায় হিসেবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে মাজরা পোকা দমনের জন্য ডায়াজিনন ৬০ (তরল) অথবা ফেনথোয়েট ৫০ (তরল) ১.৭ লিটার অথবা কার্টাপ ৫০ (পাউডার) ১.৪ কেজি, বাদামি গাছফড়িং দমনের জন্য কার্বোসালফান ২০ (তরল) বা ডায়াজিনন ৬০ (তরল) বা ক্লোরিপাইরিফস ২০ (তরল) ১ লিটার, লেদা পোকা দমনের জন্য কারবারিল ৮৫ (তরল) ১.৭ লিটার, সবুজ পাতাফড়িং, থ্রিপস, গান্ধিপোকা দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন বা ফেনিট্রোথিয়ন বা ফজালোন ১ লিটার হারে প্রয়োগ করতে হবে। এ সময় ধান ক্ষেতে উফরা, বাদামী দাগ রোগ, ব্লাস্ট, পাতাপোড়া ও টুংরো রোগসহ অন্যান্য রোগ হতে পারে। জমিতে উফরা রোগ দেখা দিলে যেকোন কৃমিনাশক যেমন ফুরাডান ৫ জি বা কিউরেটার ৫ জি প্রয়োগ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে হেক্টরপ্রতি ৪০০ গ্রাম ট্রুপার বা জিল বা নেটিভ ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে দুইবার প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে পাতাপোড়া রোগ হলে অতিরিক্ত বিঘাপ্রতি ৫ কেজি হারে পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে এবং জমির পানি শুকিয়ে ৭-১০ দিন পর আবার সেচ দিতে হবে। আর টুংরো রোগ দমনের জন্য এর বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং দমন করতে হবে।

গম ও ভুট্টা (রবি)

মাঠ থেকে কাটার পর এ দু'টি দানাদার ফসল ইতোমধ্যে বাড়ির আঙ্গিনায় চলে আসার কথা। ভালভাবে সংরক্ষণ করা না হলে ক্ষতি হয়ে যাবে অনেক। সংরক্ষণ কৌশলে ভালভাবে বীজ শুকানো, উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন, বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ, বীজ পাত্রকে মাটি বা মেঝে থেকে আলাদাভাবে রেখে সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষণ পাত্রে শুকনো নিমপাতা, বিষকাটালি পাতা রেখে দিলে সহজেই পোকার আক্রমণ রোধ করা যাবে।

ভুট্টা (খরিপ)

খরিপ ভুট্টার বয়স ২০-২৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে হাল্কা সেচ দিতে হবে, জমিতে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং একই সাথে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

পাট

বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। ও-৪ বা ফাল্গুনী তোষা ভাল জাত। স্থানীয় বীজ ডিলারদের সাথে যোগাযোগ করে জাতগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিতে তোষা পাট ভাল হয়। বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজ ৪ গ্রাম ভিটাভেক্স বা ১৫০ গ্রাম রসুন পিষে বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে নিয়ে জমিতে সারিতে বা ছিটিয়ে বুনতে হবে। সারিতে বুনলে প্রতি শতাংশে ২৫-৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। তবে ছিটিয়ে বুনলে আরেকটু বেশি অর্থাৎ ৩৫-৪০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। ভাল ফলনের জন্য শতাংশপ্রতি ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার শেষ চাষের সময় মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জমিতে সালফার ও জিংকের অভাব থাকলে জমিতে সার দেয়ার সময় শতাংশপ্রতি ৩৮০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম দস্তা সার দিতে হবে। শতাংশপ্রতি ২০ কেজি গোবর সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের পরিমান অনেক কম লাগে।

আগে বোনা পাটের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কাজগুলো যথাযথভাবে করতে হবে। এ সময় পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকার আক্রমণ হতে পারে। সেচ দিয়ে মাটির উপযোগী কীটনাশক দিয়ে উড়চুঙ্গা

দমন করতে হবে। চেলা পোকা আক্রান্ত গাছগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে এবং জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পোকা ছাড়াও পাটের জমিতে কাণ্ড পচা, কালপট্টি, নরম পচা, শিকড় গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিড়ানি, আক্রান্ত গাছ বাছাই, বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহার করলে এসব রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

শাক্‌সবজি

এ মাসে বসতবাড়ির বাগানে জমি তৈরি করে ডাঁটা, কলমিশাক, পুঁইশাক, করলা, ঢেঁড়স, বেগুন, পটল চাষের উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়া মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা, ঝিঙা, ধুন্দুল, শসা, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়ার বীজ বুনে দিতে পারেন। আগের তৈরি করা চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপন করতে পারেন। এ সময়ের অধিকাংশ সবজিই লতানো, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাচা তৈরি করে নিতে হবে। লতানো সবজির দৈহিক বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যায়। সেজন্য গাছের বাড়বাড়তি বেশি হলে লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশের পাতা লতা কেটে দিতে হবে। এতে গাছে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে। কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোরবেলা সদ্য ফোটা পুরুষফুল সংগ্রহ করে পাপড়িগুলো ফেলে দিয়ে পরাগমুণ্ডটি স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে ঘষে হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে। এ মাসে কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছি পোকা দারুনভাবে ক্ষতি করে থাকে। এক্ষেত্রে জমিতে খুঁটি বসিয়ে খুঁটির মাথায় বিষটোপ ফাঁদ দিলে বেশ উপকার হয়। এছাড়া সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করেও এ পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়।

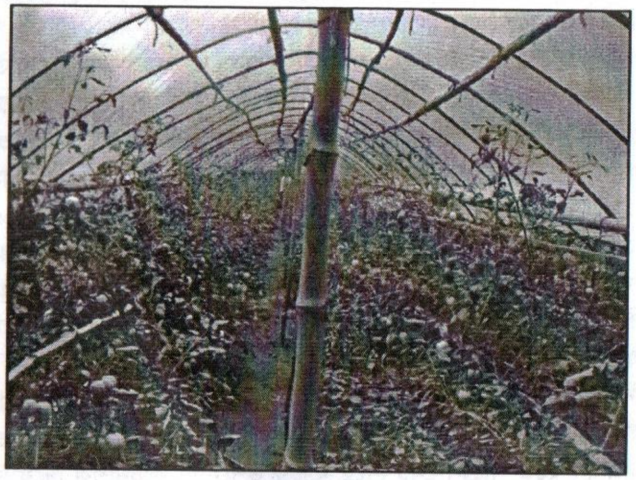

গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করতে চাইলে বারি টমেটো-৪, বারি টমেটো-৫, বারি টমেটো-৬, বারি টমেটো-১০, বারি টমেটো-১১, বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, বারি হাইব্রিড টমেটো-৫, বা বিনা টমেটো-১, বিনা টমেটো-২-এর চাষ করতে পারেন। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করতে হলে পলিথিনের ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে সেই সাথে এ ফসলটি সফলভাবে চাষের জন্য টমেটোটোন নামক হরমোন প্রয়োগ করতে হবে। স্প্রেয়ারের সাহায্যে প্রতি লিটার পানিতে ২০ মিলি টমেটোটোন মিশিয়ে ফুল আসার পর ফুলের গায়ে ৫-৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। একটু বেশি যত্ন এবং পরিচর্যা করলে অভাবনীয় ফলাফল পাওয়া যায়।

ধানের চাষপদ্ধতি

ধান বাংলাদেশের প্রধান দানাদার খাদ্যশস্য। আমাদের দেশে বছর জুড়ে আউশ, আমন ও বোরো এ তিন মৌসুমে ধান আবাদ করা হয়। ঘন বসতিপূর্ণ এ দেশের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে, অপর দিকে বিভিন্ন কারণে আবাদি জমির পরিমাণ প্রতিনিয়ত কমছে। এছাড়াও রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা। এ সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদেরকে আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষ করতে হবে।

বীজ বাছাই:

বীজ বপনের আগে বাছাই করে নিলে সুস্থ ও সবল চারা পাওয়া যায়। এজন্য দশ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে নিতে হবে। অতঃপর মিশ্রণে দশ কেজি বীজ দিয়ে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দিতে হবে। উপরে ভেসে থাকা অপুষ্ট ও হাল্কা বীজগুলো হাত বা চালনি দিয়ে সরিয়ে ফেলতে হবে। নিচে জমে থাকা পুষ্ট বীজগুলো তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ধুয়ে নিতে হবে। এ বীজগুলোই বপনের জন্য ব্যবহার করা হবে।

বীজ শোধন ও জাগ দেয়া

বাছাই করা বীজগুলোতে কোনো দাগ না থাকলে শোধন করার প্রয়োজন হয় না। তবে ৫২-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে বীজ জীবাণুমুক্ত হয়। বীজে যদি দাগ দেখা যায় তবে কারবেণ্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে এক লিটার পানিতে ৩ গ্রাম ছত্রাকনাশক মিশিয়ে এক কেজি পরিমাণ বীজ মিশ্রণে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করে ১২ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এরপর বীজ পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ঝরিয়ে নিতে হবে। পানি ঝরে গেলে বীজগুলোকে বাঁশের টুকরি বা চটের বস্তায় ভরে জাগ দিতে হবে। আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘন্টা বা ২ দিন এবং বোরো মৌসুমের জন্য ৩ দিন জাগ দিতে হবে।

বীজতলা তৈরি

বীজতলার জন্য উর্বর দোআঁশ বা এঁটেল মাটি ভালো। জমি অনুর্বর হলে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ১.০-১.৫ কেজি জৈব সার দিতে হবে। এরপর জমিতে ৫-৬ সেন্টিমিটার পানি দিয়ে ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে ৭-১০ দিন রেখে দিতে হবে। জমির আগাছা ও খড় পচে গেলে আবার চাষ ও মই দিয়ে কাঁদা করে বীজতলার জমি তৈরি করতে হবে। জমির দৈর্ঘ্য বরাবর এক মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে এবং দুই বেডের মাঝখানে ৪০-৫০ সেন্টিমিটার নালা রাখতে হবে। বেড তৈরির ৩/৪ ঘন্টা পর বীজ বপন করতে হবে।

বীজতলায় বপন ও পরিচর্যা

প্রতি বর্গমিটার বেডে ৮০-১০০ গ্রাম অঙ্কুরিত বীজ সমানভাবে বুনে দিতে হবে। বপনের সময় থেকে ৪/৫দিন পর্যন্ত জমি থেকে পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে নালা ভর্তি করে পানি রাখতে হবে।

বীজ গজানোর ৪/৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখতে হবে। এতে আগাছা ও পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বীজতলায় চারা গাছ হলুদ হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। এরপরও চারা সবুজ না হলে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার দিতে হবে।

চারা উঠানো

বীজতলায় বেশি করে পানি দিয়ে বেডের মাটি নরম করে নিয়ে এমনভাবে চারা উঠাতে হবে যেন চারার কাণ্ড মুচড়ে বা ভেঙ্গে না যায়। শুকনো খড় ভিজিয়ে নিয়ে চারার বাণ্ডিল বাঁধতে হবে।

জমি তৈরি

যেসব স্থানের মাটি অধিক সময় জলমগ্ন থাকে সেখানে জমির আগাছা পরিষ্কার করে বিনা চাষে ধান রোপণ করলেও আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে ধানের চারা রোপণের জন্য জমি কাঁদাময় করে উত্তমরূপে তৈরি করতে হবে। এ জন্য জমিতে প্রয়োজন মতো পানি দিয়ে মাটি একটু নরম হলে ১০-১৫ সেন্টিমিটার গভীর করে সোজাসুজি ও আড়াআড়িভাবে চার-পাঁচটি চাষ ও মই দিতে হবে যেন মাটি থকথকে কাঁদাময় হয়। প্রথম চাষের পর অন্তত সাত দিন জমিতে পানি আটকে রাখা প্রয়োজন। এতে জমির আগাছা, খড় ইত্যাদি পচনের ফলে গাছের খাদ্য বিশেষ করে অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন জমিতে বৃদ্ধি পায়।

চারা রোপণ

সাধারণভাবে আউশে ২০-২৫ দিনের, রোপা আমনে ২৫-৩০ দিনের এবং বোরোতে ৩৫-৪৫ দিনের চারা রোপণ করা ভালো। চারা রোপণের সময় সারি থেকে সারি ২০-২৫ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারা ১৫-২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে লাগাতে হবে। জমির উর্বরতা ও জাতের কুশি ছড়ানোর ওপর ভিত্তি করে এ দূরত্ব কম বা বেশি হতে

পারে। প্রতি গোছায় দু-তিনটি সুস্থ ও সবল চারা ২.৫-৩.৫ সেন্টিমিটার গভীরে রোপণ করতে হবে। খুব গভীরে চারা রোপণ করলে কুশি গজাতে দেরি হয় এবং কুশি ও ছড়া কম হয়। কম গভীরে রোপণ করলে তাড়াতাড়ি কুশি গজায়, কুশি ও ছড়া বেশি হয় ও ফলন বাড়ে। সে জন্য চারা রোপণের সময় জমিতে ১.২৫ সেন্টিমিটারের মতো ছিপছিপে পানি রাখা ভালো। এতে রোপণের গভীরতা ঠিক রাখার সুবিধা হয়। রোপণের পর জমির এক কোনায় কিছু বাড়তি চারা রেখে দিতে হবে। রোপণের ১০-১৫ দিন পরে যেসব স্থানের চারা মরে যাবে সেখানে বাড়তি চারা থেকে শূন্যস্থান পূরণ করা যাবে। এতে করে জমির সকল চারা একই বয়সের হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

সম্ভব হলে মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সারের মাত্রা নির্ণয় করা প্রয়োজন। জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা হলে তা প্রথম চাষের সময়ই জমিতে সমভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে জৈব সার খরিফ মৌসুমে ব্যবহার করাই ভালো। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার যেমন– টিএসপি, এমওপি, জিপসার, জিঙ্ক সালফেট মাত্রানুযায়ী জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করলে বিঘাপ্রতি ৫ কেজি ইউরিয়া সার কম লাগবে। তবে বেলে মাটিতে পটাশ সার দুই কিস্তিতে দিতে হবে। তিন ভাগের দুই ভাগ জমি তৈরির শেষ সময় এবং অবশিষ্টাংশ ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তির সাথে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সাধারণত তিন কিস্তিতে সমানভাগে ভাগ করে প্রয়োগ করতে হবে। আউশ ও আমন মৌসুমে ইউরিয়া সারের প্রথম কিস্তি শেষ চাষের সময় অন্যান্য সারের সাথে, দ্বিতীয় কিস্তি গোছায় ৪/৫টি কুশি দেখা দিলে এবং তৃতীয় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে। আর বোরো মৌসুমের জন্য প্রথম কিস্তি চারা রোপনের ১৫-২০ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি চারা রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর এবং তৃতীয় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে। তবে বেলে মাটিতে চার কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভালো।

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

ধানের জমিতে সবসময় পানি ধরে রাখতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। তবে ধানের চারা রোপণের পর জমিতে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। এতে রোপনকৃত চারায় সহজে নতুন শিকড় গজাবে। এরপর কম পানি রাখলেও চলবে। তবে ধান গাছ যেন পানির স্বল্পতায় না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বৃষ্টি নির্ভর রোপা আমন এলাকায় জমির আইল ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু ও ফাটলবিহীন রাখলে বৃষ্টির পানি দিয়েই ফসল রক্ষা করা যায়। এরপরও যদি ফসল খরা কবলিত হয় তবে প্রয়োজন অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পূরক সেচ দিতে হবে। ধান গাছের কাইচ থোড় আসার সময় থেকে ধানের দুধ হওয়া পর্যন্ত পানির চাহিদা দ্বিগুণ হয়। এ সময় জমিতে দাঁড়ানো পানি রাখতে হবে। তা না হলে ফলন অনেক কমে যাবে। ধান কাটার ১০-১২ দিন আগে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে এবং জমি শুকিয়ে নিতে হবে।

ফসল কাটা, মাড়াই ও সংরক্ষণ

অধিক পাকা ফসল কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শীষ ভেঙ্গে যায়, শীষকাটা লেদাপোকা এবং পাখির আক্রমণ হয়ে থাকে। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কাটার উপযোগী হয়। কাটার পর ধান মাঠে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করতে হবে। মাড়াই করা ধান অন্তত ৪-৫ দিন রোদে ভালোভাবে শুকানোর পর সংরক্ষণ বা বাজারজাত করতে হবে।

পুঁইশাকের চাষপদ্ধতি

ভূমিকা ও ব্যবহার

পুঁইশাক কোমল কাণ্ড ও পত্রবহুল লতানো দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ। বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় ও বর্ষজীবী ফসল হিসেবে পুঁইশাকের চাষ হয়ে থাকে। পুঁই অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সবজি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ', ক্যালসিয়াম এবং সীমিত পরিমাণে অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ লবণ বিদ্যমান আছে। এর পাতা, কচিডগা, অপক্ব ফল, ফুল ইত্যাদি শাক ও তরকারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মাটি ও জলবায়ু

সুনিকাশযুক্ত বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি এবং উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার সাথে রোদেলা পরিবেশে এটি ভালো জন্মে। মাটির অম্লমান ৫.৫ থেকে ৮-এর মধ্যে পুঁইশাক ভালো হয়। সূর্যালোকের অভাবে গাছ দুর্বল ও লিকলিকে হয় এবং শীতে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়।

জাত

লাল ও সবুজ দুই জাতের পুঁই চাষ করা হয়। উভয় জাতের পাতাই পুরু ও চওড়া এবং কাণ্ড বা ডাঁটা কোমল ও রসালো। লাল রঙের জাত হলো মনীষা। আর সবুজ রঙের জাতের মধ্যে বারি পুঁইশাক-১ (চিত্রা) জাতটি ভালো। এ ছাড়া অন্যান্য জাত হলো মাধুরী, রূপসা গ্রিন, গ্রিন লিক এসব।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বারবার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করার পর জমিতে এক মিটার বা তিন ফুট পরপর ১৫-২০ সে.মি. প্রশস্ত অগভীর নালা কাটতে হয় এবং নালার মাটি দুই দিকে ছড়িয়ে দিলে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত এক মিটার চওড়া বেড তৈরি হয়ে যায়। পরে মাচার ফসল বেডের মাঝ বরাবর এক সারিতে ১০০-১২০ সে.মি দূরত্বে আর ভূঁইয়ে ফসল ৩৫-৪০ সে.মি দূরত্বে তিন সারিতে ২৫-৩০ সে.মি পর পর মাদা বা খুবরিতে বীজ বপন বা চারা রোপণপূর্বক চাষ করতে হয়। ভূঁইয়ে/জমিতে ফসলের খরচ কম লাগে। বীজ ফসলের জন্য মাচায় পুঁই চাষ করা উত্তম। প্রতি মাদায় বা খুবরিতে ৪-৫ টি বীজ বপন করতে হয় এবং গজানোর পর ২টি করে সুস্থ ও সবল চারা রাখলেই চলে। বীজতলায় চারা উৎপাদন বা বয়স্ক ডাটার শাখা কলম করেও রোপণ করা চলে। শাক আবাদের জন্য হেক্টরে ১.৫-২.০ কেজি বীজ লাগে। বপনের আগে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে বীজ গজাতে সুবিধা হয়। পুঁইশাক সারা বছরই চাষ করা যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমেও আবাদ করা চলে।

সার ব্যবস্থাপনা

এ ফসল আবাদ করতে হলে শতাংশপ্রতি ৬০ কেজি গোবর, ৫০০ গ্রাম সরিষার খৈল, ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ কেজি, ৪০০ গ্রাম টিএসপি ও ৪০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গোবর ও টিএসপি সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময়ে সব জমিতে আর বাকি অর্ধেক চারা রোপণের গর্তে প্রয়োগ করা ভালো। পরে ফসলের অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনা করে ইউরিয়া ও পটাশ সার ৩-৪ কিস্তিতে গাছের গোড়ার চারপাশে উপরিপ্রয়োগ করা চলে।

সেচ ও পানি নিকাশ

পুঁইশাকের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট পানির প্রয়োজন হয়। তবে এ গাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। সুতরাং মাটিতে রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে ও বর্ষাকালে যাতে গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকতে পারে সে জন্য নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আগাছা পরিষ্কার ও ছাঁটাই

জমিতে নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। ফলন বেশি পেতে হলে বাউনি দিতে হবে। চারা ২৫-৩০ সেন্টিমিটার উঁচু হলে আগা কেটে দিতে হবে। এতে গাছ ঝোপালো হবে।

রোগ ও পোকামাকড়

পুঁইশাকে পাতার বিটল বা ফ্লি বিটল ছাড়া আর কোনো পোকা তেমন ক্ষতি করে না। এ পোকা পুঁইশাকের পাতা ছোট ছোট ছিদ্র করে ফেলে। সারকোস্পোরা ছত্রাকের কারণে পাতায় যে দাগ রোগ হয় তা পুঁইশাকের একটি মারাত্মক রোগ। এ ছাড়া অতিরিক্ত আর্দ্রতা, মাটিতে রসের আধিক্য ও জমিতে পানি জমে থাকলে গোড়া ও পাতা পচা রোগ হতে পারে। অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করে এসব রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ফসল সংগ্রহ ও বিপণন

চারা গজানোর ৪০-৪৫ দিন পর থেকেই ভূঁইয়ে ফসলের ২০-২৫ সে.মি. লম্বা ডগা পাতাসহ গোড়ার কিছুটা ওপরের অংশ কেটে সংগ্রহ করা চলে। ডগা সংগ্রহের পর পুনঃ পুনঃ গোড়া থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়, যা ৫-৬টি পাতা ধারণ করলে আবার সংগ্রহ করা হয়। মাচার ফসল বিলম্বে সংগ্রহ উপযোগী হয় এবং বাউনিতে লতানোর আগে সংগ্রহ করা যায় না। ডগা আঁশ আঁশ হওয়ার আগে রসাল অবস্থায় সংগ্রহ করা ও বাছাইপূর্বক আঁটি বেঁধে বিপণন করা উচিত। যথারীতি এ ফসল পরিচর্যা করলে ফল ধরার আগ পর্যন্ত গাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তার ও ফসল সংগ্রহ অব্যাহত থাকে। এতে শতাংশপ্রতি ৮০-১২০ কেজি পুঁই এবং ১.২৫ থেকে ২.২৫ কেজি বীজ জন্মে।

বীজ উৎপাদন

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বেডের ওপরে ৩০×১৫ সে.মি দূরত্বে বীজ বা চারা রোপণ করতে হয়। ডগা লতিয়ে বেশি হতে দেয়া অনুচিত। অগ্রহায়ণ মাসে গাছের ফুল ও ফল ধরে এবং ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ পাকে। মাচা করেও এ গাছে বীজ জন্মানো যায়। কিন্তু খরচ বেশি পড়ে। তবে শাক হিসেবে কাটা গাছে ভালো বীজ জন্মে না।

ঢেঁড়সের চাষপদ্ধতি

ঢেঁড়স বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালের একটি খুবই জনপ্রিয় সবজি। গ্রীষ্ম ও বর্ষা দুই মৌসুমে এ ফসলটি জন্মায়। এতে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন 'এ', 'বি', 'সি' ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে।

ঢেঁড়সের জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত জাত হলো বারি ঢেঁড়স-১ ও বারি ঢেড়স-২। এ ছাড়া বাজারে প্রাপ্ত অন্যান্য জাত হলো ইপসা ঢেঁড়স-১, গ্রিন গ্লোরি এফ-১, গ্রিন এনার্জি এফ-১, সিলভিয়া ৫ এফ-১, লাকি ৭ এফ-১, তাজা এফ-১, গ্রিন স্টার ইত্যাদি।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি ঢেঁড়স চাষের জন্য উপযোগী। পানি নিষ্কাশনের সুবিধা থাকলে এঁটেল মাটিতেও এর চাষ করা যায়। ঢেঁড়স উৎপাদনের জন্য উষ্ণ জলবায়ু প্রয়োজন।

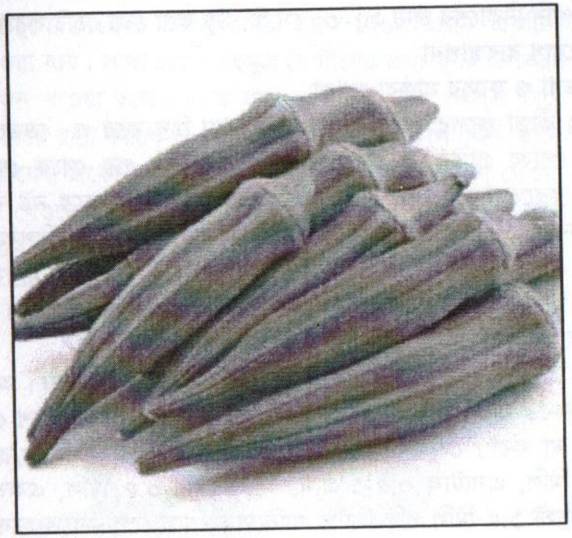

জমি তৈরি ও বীজ বপন

ভালো ফলন পেতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ করা প্রয়োজন। ঢেলা ভেঙে ও আগাছা পরিষ্কার করে ভালোভাবে জমি তৈরি করে নিতে হয়।

বীজ বপন

সারি করে এ ফসলের বীজ বপন করা হয়। এজন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সে.মি. ও সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪০ সে.মি. রাখতে হয়। বপনের আগে বীজ ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে মাঠে বপন করলে সহজে বীজ গজায়।

বপন সময়

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সারাবছর ঢেঁড়স চাষ করা সম্ভব। তবে খরিপ মৌসুমে এর ব্যাপক চাষাবাদ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস (মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য মে) বীজ বপন করার সঠিক সময়।

বীজ হার

শতাংশপ্রতি ১৬-২০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

পরিচর্যা

গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। পানি সেচ দেয়ার পর জমিতে 'জো' এলে কোদাল দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিতে হয়। এতে মাটির ভেতরে আলো বাতাস ঢুকতে পারে ও মাটি অনেক দিন রস ধরে রাখতে পারে। আগাম মৌসুমে ঢেঁড়স চাষ করলে পানি সেচ দেয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়। বর্ষাকালে পানি নিকাশের জন্য ২৫-৩০ সে.মি. উঁচু করে বেড তৈরি করতে হবে।

পোকা ও রোগ ব্যবস্থাপনা

ঢেঁড়সের ডগা ও ফলের মাজরা পোকা

এ পোকার কীড়া ফুলের কুঁড়ি, কচি ফল ও ডগা ছিদ্র করে ও ভেতরে কুরে কুরে খায়। এ পোকা প্রতিকারে চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ক্ষেত ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে। শতকরা ১০ ভাগের বেশি ক্ষতি হলে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড) ১ মিলি, ডেসিস ০.৫ মিলি, ফাসটেক ০.৫ মিলি, সবিক্রন ২ মিলি, সুমিথিয়ন ২ মিলি, ডায়াজিনন ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ঢেঁড়সের জ্যাসিড/সাদামাছি পোকা

ঢেঁড়সের চারা গাছ থেকে শেষ পর্যন্ত এরা পাতার রস চুষে খায়। আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ ও কুঁকড়ে যায়। এ পোকার আক্রমণ কমাতে জমির আশপাশে বেগুন, তুলা, মেস্তা চাষ না করা। পোকার আক্রমণ বেশি হলে পারফেকথিয়ন/রগর/টাফগর/ সানগর ২ মিলি, এসাটাফ ০.৫-১ গ্রাম, অ্যাডমায়ার ০.৫ মিলি, একতারা ০.২৫ গ্রাম, মেটাসিস্ট ১.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ঢেঁড়সের পাতার শিরা স্বচ্ছতা রোগ

এ রোগে গাছের পাতায় হলুদ ও সবুজ রঙের ছোপ ছোপ দেখা যায়। পাতার শিরাগুলো স্বচ্ছ ও হলুদ হয়ে যায়। পাতা ছোট ও খর্বাকৃতি হয়। আক্রান্ত গাছ দেখামাত্র তুলে নষ্ট বা পুঁতে ফেলতে হবে। আক্রান্ত ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ করতে হবে। ভাইরাসের বাহকপোকা সাদা মাছি এ রোগ ছড়ায়। তাই বাহকপোকা (জ্যাসিড/সাদা মাছি) দমনের জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক সবিক্রন-২ মিলি বা অ্যাডমায়ার ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে জমিতে ব্যবহার করতে হবে। ।

ঢেঁড়সের শিকড়ের গিট রোগ

আক্রান্ত গাছের শিকড়ে প্রচুর গিট দেখা যায়। গাছের পাতা ছোট, খর্বাকৃতি হয়ে যায়। ফলন কম হয়। আক্রান্ত গাছ দেখামাত্র তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। একই জমিতে বারবার এ ফসল চাষ না করাই ভালো। জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে রাখতে হবে। শেষ চাষের সময় ফুরাডান বা মিরাল ব্যবহার করতে হবে।

ফলন

শতাংশপ্রতি ৫৬-৬০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

বেগুনের চাষপদ্ধতি

বেগুন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় সবজি। বেগুন প্রায় সারাদেশেই একটি অতি পরিচিত সবজি। সারাবছরই এর চাহিদা থাকে। তাই বেগুন চাষ যথেষ্ট লাভজনক। তবে শীত মৌসুমে বেগুনের ফলন বেশি হয়। বেগুন এমন একটি সবজি যা সারাবছরই পাওয়া যায়। সাদা বেগুন বহুমুত্র রোগীদের জন্য খুবই উপকারি।
বসন্তকালে বেগুন খাওয়া ভাল। এতে কফ নাশ হয়। হিং ফোড়ন দিয়ে বেগুনের তরকারি তেল দিয়ে রান্না করলে ও খেলে যাদের বায়ুর প্রকোপ বেশি তাদের উপকার হবে। যাদের কফের প্রকোপ বেশি তাদের শীতকালে হিং ফোড়ন দেওয়া ও তেলে রান্না করা কচি বেগুনের তরকারি নিয়মিত খেলে সর্দিকাশি কমে। এছাড়া বেগুনের আরও একটি গুণ হল বেগুন মুত্রবর্ধক।

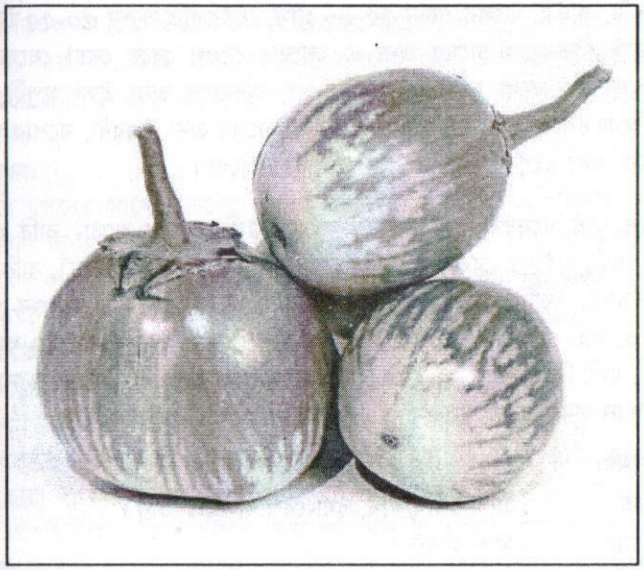

বেগুন মধুর, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ। পিত্তনাশক, জ্বর কমায়, খিদে বাড়ায়। পরিপাক করা সহজ এবং পুরুষত্ব বৃদ্ধি করে অর্থাৎ বীর্যবর্ধক। সুকোমল অর্থাৎ কচি, নরম বেগুন খাওয়ার দিক থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং শরীরের সব দোষই দূর করে। বেগুন পোড়া যদিও একটু পিত্তের প্রকোপ করতে পারে কিন্তু খুব সহজেই হজম হয়। আবার খিদেও বাড়ায়। মেদ বৃদ্ধি রোধ করে। যারা মোটা হতে চান না তাদের পক্ষে বেগুন পোড়া খাওয়া ভাল।

বেগুন সারাবছর পাওয়া যায়। দেশের সব জায়গায় এবং বসতবাড়িতেও চাষ করা যায়। এটা শীতেই সবচেয়ে ভালো হয়। কেননা গরমকালে তাপমাত্রা বেশি থাকায় বেগুনের ফুল ও ফল উৎপাদন ব্যাহত হয়, পোকা বেশি লাগে।

জাতঃ

শীতকালে বেগুন চাষ করতে হলে জাত বাছাইয়ে সতর্ক হতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ পর্যন্ত বেগুনের প্রায় ১৫০টি জাতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করেছে। এসব জাতের মধ্যে আট-দশটি জাত প্রধান। জাতগুলো হলো– শিংনাথ, ইসলামপুরী, খটখটিয়া, ঈশ্বরদী-১, দোহাজারী, চ্যাগা, ঝুমকা, কাঁটাবেগুন ইত্যাদি। শীতকালে চাষের জন্য বারি বেগুন-৪ (কাজলা) জাতটি সবচেয়ে ভালো। কেননা বেগুনের আকর্ষণীয় কালচে রঙ ও আকার অনেককে আকৃষ্ট করে। গাছে প্রচুর বেগুন ধরে, মার্চ মাস পর্যন্ত বেগুন পাওয়া যায় অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়লেও তার ধকল সইতে পারে। উচ্চফলনশীল এ জাতের গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫ টি, প্রতিটি ফলের ওজন ৫৫-৬০ গ্রাম, হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৫৫ টন। তাই চোখ বুজে শীতকালে চাষের জন্য এ জাতের বেগুন বেছে নেয়া যেতে পারে। অন্যান্য জাতের মধ্যে ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের জন্য ইসলামপুরী, বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য দোহাজারী, রাজশাহী অঞ্চলের জন্য ঈশ্বরদী, যশোর অঞ্চলের জন্য চ্যাগা এবং রংপুর অঞ্চলের জন্য খটখটিয়া ভালো।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত হলো- বারি বেগুন-১ (উত্তরা), বারি হাইব্রিড বেগুন-২ (তারাপুরী), বারি বেগুন-৪ (কাজলা), বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা), বারি বেগুন-৬, বারি বেগুন-৭, বারি বেগুন-৮, বেগুন-৯, বারি বেগুন-১০, বারি হাইব্রিড বেগুন-৩, বারি হাইব্রিড বেগুন-৪। এ ছাড়াও বারি বিটি বেগুন-১, বারি বিটি বেগুন-২, বারি বিটি বেগুন-৩ ও বারি বিটি বেগুন-৪ নামে ৪টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী।

বোনার সময়:

উন্নত জাত : গ্রীষ্ম-পৌষ/মাঘ, বর্ষা-বৈশাখ, শীত-ভাদ্র।

হাইব্রিড জাত : মাঘ-আষাঢ়।

বীজের হার:

উন্নত জাত : কাঠাপ্রতি ৩-৩.৫ গ্রাম।

হাইব্রিড জাত : কাঠাপ্রতি ১.৫ গ্রাম।

রোপণের দুরত্ব:

উন্নত জাত : ২ ফুট ✖ ২ ফুট।

হাইব্রিড জাত : ২.৫ ফুট ✖ ২ ফুট।

বেগুনের চাষপ্রযুক্তি ঃ

মাটি:

আমাদের দেশের সব ধরণের মাটিতেই বেগুনের চাষ করা যায় এবং ভালো ফলনও দিয়ে থাকে। তবে না শীত না গরম অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়াতে বেগুনের ফলন ভালো হয়। খুব গরম ও খুব আর্দ্র আবহাওয়ায় এর ফলন ভালো হয় না। আবার খুব শীতেও বেগুন গাছের ফলন ভালো হয় না। সেচ ও পানিনিকাশযুক্ত দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ জমি বেগুন চাষের জন্য উপযুক্ত। বেগুনের জন্য দীর্ঘ লম্বা সময়ব্যাপি নিম্নতাপমাত্রা (১৫-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) সবচেয়ে উপযোগী।

বীজ হার ঃ

অঙ্কুরোদগমের জন্য ৮০% বিবেচনায় বীজের পরিমাণ হলো হেক্টরপ্রতি ২০০-২৫০ গ্রাম। ১২৫ টি বীজ ৫ গ্রাম ওজনের প্যাকেটে থাকে।

বীজ বাছাই:

ভালো ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে নির্দিষ্ট জাতের গুণাগুণ সম্পন্ন বেগুনের উচ্চ ফলন আশা করা যায় না। তাই বেগুনের বীজ বপনের পূর্বে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। সেজন্য অপুষ্ট, ভাঙ্গা ও অন্য শস্যের বীজ থাকলে তা বাছাই করে নিতে হবে।

বীজ শোধন:

বীজতলায় বপনের আগে বেগুনের বীজকে প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা ক্যাপটান ব্যবহার করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। আর বীজ শোধন করে নিলে এ্যানথ্রাকনোজ, লিফস্পট, ব্লাইট ইত্যাদি রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

বীজতলা তৈরি ও চারার বয়স ঃ

বেগুনের বীজ বীজতলা তৈরি করতে লাগে। বীজতলার মাটি ধুলোর মতো গুঁড়ো হতে হবে। সাধারণত বীজ বোনার ৪/৫ সপ্তাহ পরে চারা তৈরি হয়। এগুলো তুলে ক্ষেতে বসাতে হয়। বেগুনের চারাও সারি দিয়ে বসাতে হয়। প্রতি একরে প্রায় ৪,৫০০ চারা দরকার লাগে। চারা লাগানোর পর হাল্কা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও প্রখর রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন বা চাটাই ব্যবহার করে ঢাকতে হবে। মূল জমিতে চারা লাগানোর পূর্বে বীজতলা থেকে তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হলে চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়, চারা অধিক সবল ও তেজি হয়। বীজতলা সাধারণত এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। জমির অবস্থা ভেদে দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানো যেতে পারে। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে। বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্নের সাথে তুলতে হবে যাতে চারার শিকড় ছিঁড়ে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ জন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। চারা রোপণ করার পর গোড়ায় হাল্কা সেচ দিতে হবে।

বীজতলায় বীজ বপনের সময়: শীতকালে (সেপ্টেম্বর মাস), গ্রীষ্মকালে (মার্চ মাস)।

রোপণ দূরত্ব: ১২০×৭০ সে.মি হলে হেক্টরপ্রতি ১১,৯০০ টি চারার প্রয়োজন হয়।

চারা রোপণ দূরত্ব:

চারা রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে মূলত আপনি কোন জাতের চারা লাগাবেন। যেমন ছড়ানো জাত যদি হয় তাহলে বেশি দূরত্ব লাগবে আর যদি গাছ খাড়া হয় তাহলে দূরত্ব কম লাগবে। তবে সাধারণত ৭০ সে.মি প্রশস্ত বেডে এক সারিতে চারা রোপণ করা হয়। দুটি বেডের মাঝে ৫০ সে.মি নালা থাকতে হবে আর সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৭০ সে.মি।

পরিচর্যা ঃ

এই রোগটি ভাইরাস জনিত রোগ। এই রোগ অন্য বেগুন গাছকে নষ্ট করে দেয়। চারা লাগানোর পর থেকে ৩/৪ দিন গাছের প্রয়োজন মতো পানি দেয়া দরকার। মাঝে মাঝে গাছের গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে আলগা করে দিতে হয়। তিন চারদিন পানি দেয়ার পর থেকে সপ্তাহে একবার পানি দিলেই চলবে। বেগুনে একটা খুব খারাপ রোগ হয় তাকে কুটে ধরা রোগ বলে। এই রোগ যদি গাছে দেখা দেয় তাহলে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

সার প্রয়োগ:

নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে–

সার	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	শেষ চাষের সময় (কেজি)	গর্তে প্রয়োগ (কেজি)	চারা লাগানোর ১৫ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	১০,০০০	৫,০০০	৫,০০০	-
ইউরিয়া	৩০০	-	-	৬০ কেজি
টিএসপি	২৫০	১২৫	১২৫	
এমপি	২০০	-	৫০	৪৫ কেজি
জিপসাম	১০০	সব	-	-
বোরিক এসিড (বোরণ)	১০	সব	-	-

এবং

সার	ফুল ধরা আরম্ভ হলে	ফল ধরা আরম্ভ হলে	ফল আহরণের সময়	ফল আহরণের সময়
গোবর/কম্পোস্ট	-	-	-	-
ইউরিয়া	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি
টিএসপি	-	-	-	-
এমপি	৫২.৫ কেজি	৫২.৫ কেজি	-	-
জিপসাম	-	-	-	-
বোরিক এসিড (বোরণ)	-	-	-	-

সার প্রয়োগ পদ্ধতি:

শেষ চাষের সময় অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং সবটুকু জিপসাম ও বোরিক এসিড সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং ৩৫-৪২.৫ কেজি এমপি সার চারা লাগানোর ৭ দিন আগে গর্তে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ ইউরিয়া (৫টি কিস্তিতে) ও বাকি এমপি সার (প্রথম ৩টি কিস্তিতে) যথাক্রমে চারা লাগানোর ১৫ দিন পর, ফুল ধরা আরম্ভ হলে, ফল ধরা আরম্ভ হলে, ফল আহরণের সময় দুইবার সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা ও সেচ পদ্ধতি:

প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে করে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে। জমিকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিড়ানি দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী নিড়ানি দিলে মাটিতে শিকড়ের বৃদ্ধি বেশ ভালো হয়। চারা রোপণের পর ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হাল্কা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হবে। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। তবে বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। বেগুন গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই বেডের দুই পাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দিলে ভালো হবে। খরিপ মৌসুমে জমিতে যাতে পানি না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারপাশে নালা রাখতে হবে।

বেগুনের পোকামাকড় ও রোগবালাই:

ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা:

রোপণের ৪/৫ সপ্তাহ পর এ পোকার আক্রমণ দেখা যায়। ডিম থেকে কীড়া গাছের নরম ও কচি ডগা ও পত্রবৃন্ত ছিদ্র করে। ফলে ডগা ঢলে পড়ে এবং শুকিয়ে যায়। পরবর্তীতে বেগুন ফলে আক্রমণ করে। গ্রীষ্মকালে এ পোকা বেশি সক্রিয় হয়। প্রতিকারের জন্য ক্ষেত থেকে আক্রান্ত ডগা, মরা পাতা সরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতিবছর একই জমিতে বেগুনের চাষ করা যাবে না। সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ মথ ধরে নষ্ট করে ফেলতে হবে। সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে পটাশ সার ব্যবহারে গাছের বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড, বাসথ্রিন, সবিক্রন ইত্যাদি) ১ মি.লি অথবা ডেসিস ০.৫-১ মি.লি অথবা কার্বোফুরান (৪ কেজি/একর) অথবা ডায়াজিনন বা সুমিথিয়ন ১.৫-২.০ মি.লি প্রতিলিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

জ্যাসিড বা শোষক পোকা:

এ পোকা বয়স্ক ও বাচ্চা উভয়েরই ক্ষতি করে। আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ হয়ে পাতা হলুদ হয়ে তামা রঙ ধারণ করে এবং পরে শুকিয়ে যায়। প্রতিকারের জন্য ক্ষেত সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাতজাল বা অন্য কোন উপায়ে পোকা সংগ্রহ করতে হবে। ৫০০ গ্রাম নিম বীজের শাঁস পিষে ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে তা

ছেঁকে জ্যাসিড আক্রান্ত ক্ষেতে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যেতে পারে। এ পোকা
দমনের জন্য ডায়মেথয়েট ৪০ ইসি (রগর, টাফগর, সারগর, পারফেকথিয়ন) ১
মি.লি অথবা এডমায়ার ১ মি.লি অথবা মেটাসিস্টক্স ১ মি.লি অথবা সবিক্রন ১
মি.লি অথবা এসাটাফ ১.৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে
হবে।

পাতা মোড়ানো পোকা:

এ পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে ও কীড়া অবস্থায় পাতা মোড়ায়। এ
পোকা কচি পাতার উপর বেশি আক্রমণ করে। প্রতিকারের জন্য আক্রান্ত পাতা
সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে। ক্ষেত সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সুমিথিয়ন অথবা ফলিথিয়ন-২ মি.লি প্রতি লিটার পানির
সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ছাতরা পোকা:

এ পোকা পাতার কাণ্ড ও ডগার রস চুষে খায়। আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে।
প্রতিকারের জন্য আক্রান্ত ডাল ও পাতা দেখামাত্র তা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে
ফেলতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ম্যালাথিয়ন বা সুমিথিয়ন ২ মি.লি অথবা
মারসাল ২০ ইসি ১ মি.লি অথবা ডায়মেথয়েট ৪০ ইসি ২ মি.লি হারে প্রতি লিটার
পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

লাল ক্ষুদ্র মাকড়:

এ মাকড় লাল রংয়ের এবং অত্যন্ত ছোট হয়। এ পোকা অত্যন্ত ছোট এবং পাতার
নিচে থাকে ও সহজে দেখা যায় না। প্রতিকারের জন্য আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে
ম্যালাথিয়ন বা সুমিথিয়ন ২ মি.লি অথবা মারসাল ২০ ইসি ১ মি.লি অথবা
ডায়মেথয়েট ৪০ ইসি ২ মি.লি হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে
হবে।

কাঁঠালে পোকা:

পূর্ণ বয়স্ক বিটল ও গ্রাব উভয়ই পাতা খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। এ পোকা পাতা ঝাঁঝরা
করে ফেলে, পরে পাতা শুকিয়ে যায় এবং একসময় ঝরে পড়ে। প্রতিকারের জন্য এ
পোকার আক্রমণ দেখা দিলে গাছে ছাই ছিটাতে হবে এবং ক্ষেত সব সময় পরিষ্কার
পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। শতকরা ১০ ভাগ পাতা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে
ডেনিটল/ট্রিবন-১ মি.লি বা সুমিথিয়ন-২ মি.লি বা সেভিন-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানির
সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ঃ

চারা রোপণের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে। ফুল ফোটার দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে বেগুন খাওয়ার মতো উপযুক্ত হয়ে যায়।

ফলন:

উন্নত জাত: কাঠাপ্রতি ১-২ কুইন্টাল।

হাইব্রিড জাত: কাঠাপ্রতি ২-২.৫ কুইন্টাল।

পটলের চাষপদ্ধতি

পটল একটি অন্যতম পরিচিত সবজি। পটল ভিটামিনযুক্ত পুষ্টিকর সবজি। বছরে ৭-৮ মাস বাজারে পটল পাওয়া যায়। বাংলাদেশের যশোর, রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, বগুড়া, ফরিদপুর, পাবনা ইত্যাদি এলাকায় বাণিজ্যিকভিত্তিতে পটলের চাষ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে ৬৮ হাজার টন পটল উৎপাদন করা হয়। যা ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের তুলনায় ১.৫ গুণেরও বেশি।

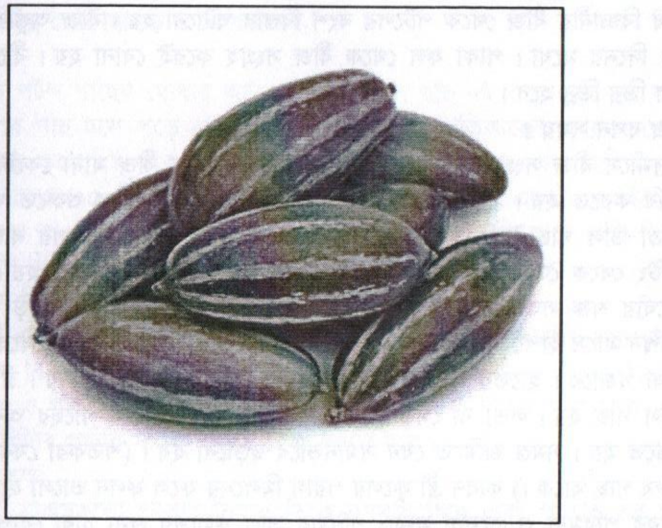

পটলের পুষ্টিগুণ ঃ

পটলে পুষ্টি (ভক্ষণযোগ্য অংশের প্রতি ১০০ গ্রামে) বিদ্যমান থাকে– আমিষ ১.২ গ্রাম, শ্বেতসার-৪.৪ গ্রাম, ক্যারোটিন-১৩৫ আন্তর্জাতিক একক, ভিটামিন বি-১ ০.০৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২-০.০৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি-৩ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম-২০ মিলিগ্রাম, জলীয় অংশ-৯৪%, ক্যালরি-২৬ কিলোক্যালরি।

জাত ঃ

বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কয়েকটি পটলের জাত হচ্ছে– বারি পটল-১, বারি পটল-২।
হাইব্রিড পটলের জাত: বারি হাইব্রিড পটল-১।
এছাড়াও আরো নানা জাতের পটল পাওয়া যায়-গুলি, কল্যাণী, দান্দলি, কাজলী, বিহার সরিফ, সোপারি সফেদা, নিরিয়া, সন্তোখিয়া, দামোদর, ঘুসুট বোম্বাই, আমড়া বাঁটি, ইত্যাদি জাতের পটল।

পটলের চাষপদ্ধতি ঃ

জমি ঃ

পলিমাটি ও দোআঁশ মাটিতে পটলের চাষ খুব সহজ। হাল্কা মাটির অঞ্চলে আটমাস পটল হয়। ভারি মাটির অঞ্চলে চৈত্র থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত পটল হয়। তিন-চার বার লাঙ্গল করে মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। তারপর কিছুটা দূরে মাদা তৈরি করে সার মেশাতে হয়।

বীজ ঃ

পটলের লতা, কাটিং বা বীজ থেকে পটলের চাষ হয়। বীজ থেকে সহজে ভাল চারা হলেও পটল চাষীদের কাছে তার কোন কদর নেই। নতুন প্রজাতি পাওয়ার আশায় কৃষি বিজ্ঞানীর বীজ থেকে পটলের বংশ বিস্তার ঘটানো হয়। বীজ অঙ্কুরিত হয় ৭-১৪ দিনের মধ্যে। পাকা ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করেই বোনা হয়। বীজের চারার ফল ভিন্ন ভিন্ন হবে।

বীজ বপন সময় ঃ

ভাদ্রমাসে বীজ সংগ্রহ করা হয়। আশিন-কার্তিক মাসে বীজ মাদা কেটে বুনে চারা তৈরি করতে হয়। সমস্ত শীতকালে পরিচর্যার ফলে মৌসুমের শুরুতে ফল দেয়ার মতো ভাল গাছ তৈরি হয়ে যায়। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পটলের বাছাই লতার কাটিং থেকে তৈরি চারা ২ মিটার ব্যবধানে তৈরি মাদায় লাগাতে হয়। ৪ মিটার দৈর্ঘ্যের শক্ত লতা কেটে নিয়ে তাকে ৩০ সে.মি ব্যাসের একটি বাড়ি তৈরি করে আশ্বিন মাসে হাপরে বসাতে হবে। একমাসের মধ্যে লতার গাঁটগুলি থেকে শিকড় ও শাখা গজাবে। হাতের আঙুলের চেয়ে মোটা গেঁড় নেয়া উচিত নয়। স্ত্রী ও পুরুষ পটল গাছ হয়। লতা বা গেঁড় লাগানোর সময় স্ত্রী ও পুরুষ গাছের অনুপাত ঠিক রাখতে হয়। সমস্ত জমিতে যেন সমানভাবে ছড়ানো হয়। (শতকরা যেন ৫-১৫ টি পুরুষ গাছ থাকে।) কারণ স্ত্রী ফুলের পরাগ মিলনের ফলে ফলন ভালো হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ মাত্রা: পটলের ভাল ফলনের জন্য চারা রোপণের সময় গোবর বা আবর্জনা সার প্রতি মাদায় ৩-4 কেজি এবং টিএসপি সার ৫০-৬০ গ্রাম করে দিতে হবে। তারপর তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি অর্থাৎ রোপণের ২০ দিন পর প্রতি মাদায় ইউরিয়া সার ২০-২৫ গ্রাম এবং এমওপি সার প্রতি মাদায় ২০-২৫ গ্রাম। দ্বিতীয় কিস্তি অর্থাৎ রোপণের ৬০ দিন পর প্রতি মাদায় ইউরিয়া ২০-২৫ গ্রাম এবং এমওপি সার ২০-২৫ গ্রাম এবং তৃতীয় কিস্তি অর্থাৎ ৯০ দিন পর প্রতি মাদায় ইউরিয়া ২০-২৫ গ্রাম এবং এমওপি ২০-২৫ গ্রাম দিতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

গোবর বা আবর্জনা সার ভালোভাবে পচিয়ে নিতে হবে। পটল একটি দীর্ঘমেয়াদী সবজি ফসল সেজন্য জুন মাস থেকে ফসল সংগ্রহের পর প্রতি মাসে হেক্টরপ্রতি ১৮ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি এবং ১৪ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। আর এই সারগুলি প্রয়োগ করলে ফলন তুলনামূলক বেশি হবে।

পরিচর্যা ঃ

পটল চাষে প্রথম থেকেই বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন। শীতের শুরুতে নতুন ও পুরোনো গেঁড়গুলি ঠিক রেখে সব লতা কেটে ক্ষেত পরিষ্কার করে দিতে হয়। ওই সময় ক্ষেতে প্রয়োজন মতো গেঁড় রেখে বাদবাকি তুলে ফেলে অন্য ক্ষেতে লাগানো বা অন্য চাষীর কাছে বিক্রি করে দেয়া যেতে পারে। লাগানোর পর মাদার মাটিকে ছায়ায় রাখার জন্য খড় দিয়ে ঢেকে দেয়ার রেওয়াজ আছে। চারা না গজানো পর্যন্ত মাদার মাটিকে অল্পমাত্রায় আর্দ্র রাখতে হবে। পোকা পটলের ক্ষতি করতে পারে না। রোগ দমন করার জন্য নিয়মিত ছত্রাকনাশক ছিটানো দরকার। ১০-১৫ দিন অন্তর পর্যায়ক্রমে বোর্দো মিকচার ডায়থেন এম-৪৫ ব্যাভিস্টিন/অটোস্টিন স্প্রে করতে হয়।

পটলের বিভিন্ন পোকামাকড় ও রোগবালাই

উঁই পোকা:

উই পোকা পটল গাছের মোথায় আক্রমণ করে ফলে গাছ নষ্ট করে দেয় যার ফলে কিছুদিন পর গাছ ঢলে পড়ে এবং শুকিয়ে মারা যায়। প্রতিকারের জন্য এ রোগে আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে। পটলের চাষ করার জন্য জমি তৈরির সময় কার্বোফুরান ৫ জি বা বাসুডিন ১০ জি এর যে কোন একটি বালাইনাশক ব্যবহার করা বা ক্লোরোপাইরিফস (ডার্সবান, লর্সবান) ৫ মি.লি হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

আঁশ পোকা/মিলি বাগ ঃ

ছোট ছোট এক ধরণের আঁশ পোকা কাণ্ড ও পাতার রস চুষে ফসলের সমুহ ক্ষতি করে। কাণ্ড বিবর্ণ ও শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিকারের জন্য এ রোগে আক্রান্ত গাছের কাণ্ড ও গাছ তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে। মার্শাল ২ মি.লি বা মিপসিন ১.৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পটলের মাকড়:

ছোট ছোট মাকড়গুলো পাতার নিচের দিকে বসবাস করে এবং পাতার রস চুষে খেয়ে পাতা বিবর্ণ করে দেয় এবং শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিকারের জন্য আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ম্যালাথিয়ন বা সুমিথিয়ন ২ মি.লি অথবা মারসাল ২০ ইসি ১ মি.লি অথবা ডায়মেথয়েট ৪০ ইসি ২ মি.লি হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কাণ্ড মাছি পোকা:

এ পোকার কীড়া গাছের কাণ্ডের নরম অংশ ছিদ্র করে ঢুকে এবং সে অংশ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। প্রতিকারের জন্য গাছের আক্রান্ত অংশ সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কার্বোফুরান ৫ জি অথবা ডায়াজিনন ১০ জি (৫-১০ গ্রাম দানাদার/গাছ প্রতি) অন্তর্বাহি কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ঃ

কচি অবস্থায় সকালে অথবা বিকালে পটল সংগ্রহ করা উচিত। পটল একবার চাষ করলে, ঠিকমত পরিচর্যা করলে, তিন চার বছর ধরে ফসল পাওয়া যায়। নিয়মিত

পরিচর্যা অবশ্যই দরকার। বর্তমানে সারাবছরই বাজারে পটলের চাহিদা থাকায় পটল চাষ বেশ লাভজনক। লতা লাগানোর ৯০ দিন পরই গাছে ফল আসা শুরু হয়। স্ত্রী ফুলের পরাগায়ন হওয়ার ১০-২০ দিন পরই পটল তোলার সময় শুরু হয়।

ফলন ঃ জাতভেদে হেক্টরপ্রতি ফলন হয় ১০-৪০ টন।

গাছপালা

এ মাসে আমের মাছি পোকাসহ অন্যান্য পোকার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। মাছি পোকা দমনের জন্য সবজি খেতে যে রকম বিষটোপ ব্যবহার করা হয় সে ধরনের বিষটোপ বেশ কার্যকর। ডিপটরেক্স, ডারসবান, ডেনকাভেপন সামান্য পরিমান দিলে উপকার পাওয়া যায়।

এ সময় কাঁঠালের নরম পঁচা রোগ দেখা দেয়। এলাকায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব থাকলে ফলে রোগ দেখা দেয়ার আগেই ফলিকুল ০.০৫% হারে বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা রিডোমিল এম জেড-৭৫ প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

নারকেলের চারা এখন লাগাতে পারেন। ভালো জাতের সুস্থ সবল চারা ৬-৮ মিটার দূরে লাগানো যায়। গর্ত হতে হবে দৈর্ঘে ১ ফুট, প্রস্থে ১ ফুট এবং গভীরতায় ১ ফুট। নারিকেলের চারা রোপণের ৫-৭ দিন আগে প্রতি গর্তে জৈব সার ১০ কেজি, টিএসপি ৭৫০ গ্রাম, এমওপি ৫৫০ গ্রাম এবং জিপসাম ৫০০ গ্রাম ভালভাবে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজতলা থেকে যেদিন চারা উঠানো হবে সেদিনই জমিতে চারা রোপন করা সবচেয়ে ভাল। অন্যথায় যতদ্রুত সম্ভব চারা রোপন করতে হবে। চারা রোপনের সময় চারাটিকে এমনভাবে গর্তে বসিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে যাতে নারিকেলের পিঠের কেবল ইঞ্চি খানেক মাটির উপরে ভেসে থাকে এবং বাকিটা মাটির নিচে থাকে।

গ্রামের রাস্তার পাশে পরিকল্পিতভাবে খেজুর ও তালের চারা এখন লাগাতে পারেন। যত্ন, পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারলে ২-৩ বছরেই গাছগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে। ভাল ফলনের জন্য এসময় বৃক্ষ জাতীয় গাছের বিশেষ করে ফল গাছের প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে হবে।

মাতৃগাছের পরিচর্যা, আগাছা দমন, প্রয়োজনীয় সেচ দিলে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। বৃষ্টি হয়ে গেলে পুরাতন বাঁশ ঝাড় পরিষ্কার করে কম্পোস্ট সার দিতে হবে এবং এখনই নতুন বাঁশ ঝাড় তৈরি করার কাজ হাতে নিতে হবে। যারা সামনের মৌসুমে গাছ লাগাতে চান তাদের এখনই জমি নির্বাচন, বাগানের নকশা প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রাথমিক কাজগুলো সেরে রাখতে হবে।

বৈশাখ আসে আমাদের জন্য নতুন আবাহনের সৌরভ নিয়ে। সাথে আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসে কালবৈশাখীকে। কালবৈশাখীর থাবা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে কৃষিতে আগাম বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সুবিবেচিত লাগসই কৌশল আর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সব বাঁধা ডিঙ্গিয়ে আমরা কৃষিকে নিয়ে যেতে পারবো সমৃদ্ধির ভুবনে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষি

(মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি)

জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা ও মিষ্টি ফলের মৌ মৌ গন্ধে মাতোয়ারা বাংলার দিক প্রান্তর। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তরমুজ, বাঙ্গিসহ মৌসুমি ফলের সুভাষিত ঘ্রাণ আমাদের রসনাকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে যায়। এছাড়াও মৌসুমি ফলের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তৈরি আচার, চাটনি, জ্যাম, জেলি জ্যৈষ্ঠের গরমে ভিন্ন স্বাদের ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়। আর এ মধুমাসে চলুন একপলকে জেনে নেই জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষি কথা। আগে বীজতলায় বপনকৃত খরিফ-২ এর সবজির চারা রোপণ, সেচ ও সার প্রয়োগ, বিভিন্ন পরিচর্যা, সজিনা সংগ্রহ এবং গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণ ও পরিচর্যা। ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, পটল, কাঁকরোল সংগ্রহ, পোকামাকড় দমন। নাবী কুমড়া জাতীয় ফসলের মাচা তৈরি, সেচ ও সার প্রয়োগ। ফলের চারা রোপণের গর্ত প্রস্তুত ও বয়স্ক ফল গাছে সুষম সার প্রয়োগ, ফল সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।

বোরো ধান

বোরো ধান কাটার সময় হয়ে গেছে। আপনার জমির ধান শতকরা ৮০ ভাগ পেকে গেলে জমির ধান সংগ্রহ করে কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। ধান সংগ্রহের জন্য কম্বাইন্ড হার্ভেস্টর ব্যবহার করলে ধানের অপচয় যেমন রোধ হয় তেমনি সময় ও শ্রম কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ধানের সংগ্রহ থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পর্যন্ত অপচয় হতে পারে। এ জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে এবং সকল পর্যায়ে ধানের অপচয় যেন কম হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শুকনো বীজ ছায়ায় ঠাণ্ডা করে প্লাস্টিকের ড্রাম, বিস্কুটের টিন, মাটির কলসি ইত্যাদিতে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোনা আউশ

আউশের বীজ ইতোমধ্যে মাঠে বোনা হয়ে যাবার কথা। না হয়ে থাকলে এখনই বীজ বপন করতে হবে। চারার বয়স ১২ থেকে ১৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের প্রথম কিস্তি হিসেবে হেক্টরপ্রতি ৪৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। তবে গুড়া

ইউরিয়ার পরিবর্তে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করলে ২৫ শতাংশ সার কম লাগবে এবং ফলনও বেশি হবে। আর জমিতে গুড়া ইউরিয়া প্রয়োগ করে থাকলে প্রথম উপরি প্রয়োগের ১৫ দিন পর একই মাত্রায় দ্বিতীয় কিস্তি উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারের কার্যকারিতা বাড়াতে জমিতে সার প্রয়োগের সময় ছিপছিপে পানি থাকা, জমি আগাছামুক্ত রাখা জরুরি।

আমন ধান

নিচু এলাকায় বোরো ধান কাটার ৭-১০ দিন আগে বোনা আমনের বীজ ছিটিয়ে দিলে বা বোরো ধান কাটার সাথে সাথে আমন ধানের চারা রোপণ করলে বন্যা বা বর্ষার পানি আসার আগেই চারা সতেজ হয়ে ওঠে এবং পানি বাড়ার সাথে সাথে সমান তালে বাড়ে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর সামান্য পরিমান ইউরিয়া ছিটিয়ে দিলে চারা তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং ফলন ভাল হয়।

এ মাসের মধ্যেই রোপা আমনের জন্য বীজতলা তৈরি করতে হবে। রোদ পড়ে এমন উচু জমি নির্বাচন করে চাষ, মই, পানি দিয়ে ভালভাবে থকথকে কাঁদাময় করে নিতে হবে। জমি উর্বর হলে সাধারণত কোন রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না, তবে অনুর্বর হলে প্রতি বর্গমিটার বীজতলার জন্য ২ কেজি জৈবসার মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রতি বর্গমিটার জমির জন্য ৮০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ বোনার আগে অংকুরিত করে নিলে চারা তাড়াতাড়ি গজায়, এতে পাখি বা অন্য কারণে ক্ষতি কম হয়। বীজ বোনার আগে বীজতলায় একস্তর ছাই ছিটিয়ে দিলে চারা তোলার সময় উপকার পাওয়া যায়। ভাল চারা পাওয়ার জন্য বীজতলায় নিয়মিত সেচ দেয়া, অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করা, আগাছা দমন, সবুজ পাতা ফড়িং ও থ্রিপস এর আক্রমণ প্রতিহত করাসহ অন্যান্য কাজগুলো সতর্কতার সাথে করতে হবে। চারা হলুদ হলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এরপরও যদি চারা হলুদ থাকে তবে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।

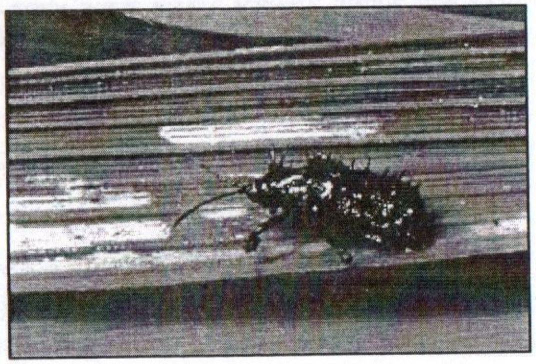

জ্যৈষ্ঠ মাসে আউস ও বোনা আমনের জমিতে পামরী পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। পামরী পোকা ও এর কীড়া পাতার সবুজ অংশ খেয়ে গাছের অনেক ক্ষতি করে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে হাতজাল, গামছা, লুঙ্গি, মশারি দিয়ে পামরী পোকা ধরে মেরে ফেলে আক্রমণ কমানো যায়। তাছাড়া আক্রান্ত গাছের গোড়া থেকে ৫ সেন্টিমিটার (২ ইঞ্চি) রেখে বাকি অংশ কেটে কীড়া ও পোকা ধ্বংস করা যায়। আক্রমণ যদি বেশি হয় অর্থাৎ প্রতি গাছে ৪টি বয়স্ক পামরী পোকা বা প্রতি পাতায় ১৫টি কীড়া দেখা দিলে অথবা জমির শতকরা ৩৫টি পাতা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলে অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। এ পোকা দমনে প্রতি হেক্টরে ১ লিটার হারে ফেনিট্রোথিয়ন বা ম্যালাথিয়ন বা ফজালোন বা ফেনথিয়ন বা কুইনালফস বা ক্লোরপাইরিফস ব্যবহার করতে পারেন।

পাট

পাটের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, ঘন ও দুর্বল চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কাজগুলো যথাযথভাবে করতে হবে। ফাল্গুনি তোষা জাতের জন্য হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে বা দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে হাল্কা সেচ দিতে হবে এবং বৃষ্টির কারণে পানি জমে থাকলে তা নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। পাটের শাক যেমন- সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকর। তাই নিড়ানির সময় তোলা অতিরিক্ত পাটের চারা ফেলে না দিয়ে শাক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এ মাসে পাটের বিছাপোকা এবং ঘোড়া পোকা জমিতে আক্রমণ করে থাকে। বিছা পোকা দলবদ্ধভাবে পাতা ও ডগা খায়, ঘোড়া পোকা গাছের কচি পাতা ও ডগা খেয়ে পাটের অনেক ক্ষতি করে থাকে। বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকার আক্রমণ রোধ করতে পোকার ডিমের গাদা, পাতার নিচ থেকে পোকা সংগ্রহ করে মেরে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। জমিতে ডালপালা পুঁতে দিলে পোকা খাদক পাখি যেমন- শালিক, ফিঙ্গে এসব পোকা খেয়ে আমাদের দারুন উপকার করে। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে, সঠিকমাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতি লিটার পানিতে সেভিন ২ গ্রাম বা সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড) ১ মি.লি বা ডায়াজিনন ২ মি.লি অথবা মেটাসিস্টক্স ২ মি.লি হারে মিশিয়ে ক্ষেতে স্প্রে করতে হবে।

শাক্‌সবজি

মাঠে বা বসত বাড়ির আঙ্গিনায় গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির পরিচর্যা সতর্কতার সাথে করতে হবে। এ সময় সারের উপরিপ্রয়োগ, আগাছা পরিষ্কার, গোড়ায় বা কেলিতে মাটি তুলে দেয়া, লতা জাতীয় সবজির জন্য বাউনি বা মাচার ব্যবস্থা করা খুব জরুরি।

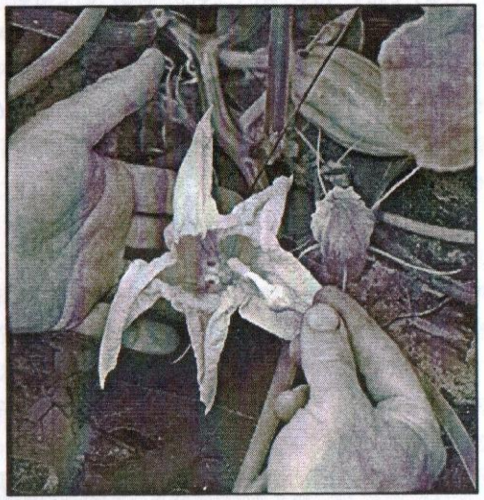

লতানো সবজির দৈহিক বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যায়। সেজন্য বেশি বৃদ্ধি সমৃদ্ধ লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশের পাতা লতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে। কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোরবেলা হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে।

এ মাসে কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছি পোকা দারুন ভাবে ক্ষতি করে থাকে। এক্ষেত্রে জমিতে খুঁটি বসিয়ে খুঁটির মাথায় বিষটোপ ফাঁদ দিলে বেশ উপকার হয়। এছাড়া সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করেও এ পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়। সবজিতে ফল ছিদ্রকারী পোকা, জাব পোকা, বিভিন্ন বিটল পোকা সবুজ পাতা খেয়ে ফেলতে পারে। হাত বাছাই, পোকা ধরার ফাঁদ, ছাই ব্যবহার করে এসব পোকা দমন করা যায়। তাছাড়া আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলে এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে প্রয়োগকৃত বালাইনাশকের বিষের প্রভাব যেন ৩/৪ দিনের বেশি না থাকে।

মাটির জোঁ-এর অবস্থা বুঝে প্রয়োজনে হাল্কা সেচ দিতে হবে। সেই সাথে পানি নিকাশের ব্যবস্থা সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতে হবে।

করলার চাষপদ্ধতি

উচ্ছে ও করলা আমাদের দেশের প্রায় সব জেলাতেই চাষ হয়। আগে শুধু গরমকালে উচ্ছে-করলা উৎপাদিত হলেও এখন জাতের গুণে প্রায় সারাবছরই চাষ করা যায়। যেগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট, গোলাকার, বেশি তিতা, সেগুলোকে বলা হয় উচ্ছে। বড়, লম্বা ও কিছুটা কম তিতা স্বাদের ফলকে বলা হয় করলা। উচ্ছে গাছ ছোট ও কম লতানো হয়। করলা গাছ বেশি লতানো ও লম্বা লতাবিশিষ্ট, পাতাও বড়। উচ্ছে ও করলা তিতা বলে অনেকেই খেতে পছন্দ করেন না। তবে এর ঔষধিমূল্য অনেক বেশি। প্রাচীনকাল থেকেই করলার তরকারি খাওয়ার প্রচলন আছে। অনেক সময় করলার তেতো ভাব কমানোর জন্য টুকরো করে কেটে লবণ মাখিয়ে হাত দিয়ে চটকে নিয়ে রস নিংড়ে নেওয়া হয়। করলার উপরকার ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। এত তেতো ভাব কমে বটে কিন্তু এইভাবে ছাল ছাড়িয়ে ও রস নিংড়ে খেলে করলার গুণ অনেক কমে যায়। ডায়াবেটিস, চর্মরোগ ও কৃমি সারাতে এগুলো ওস্তাদসবজি। ভিটামিন ও আয়রন-সমৃদ্ধ এই সবজির অন্যান্য পুষ্টিমূল্যও কম নয়। শীতের দুই একমাস বাদ দিলে আমাদের দেশে বছরের যে কোন সময় করলা জন্মানো যায়।

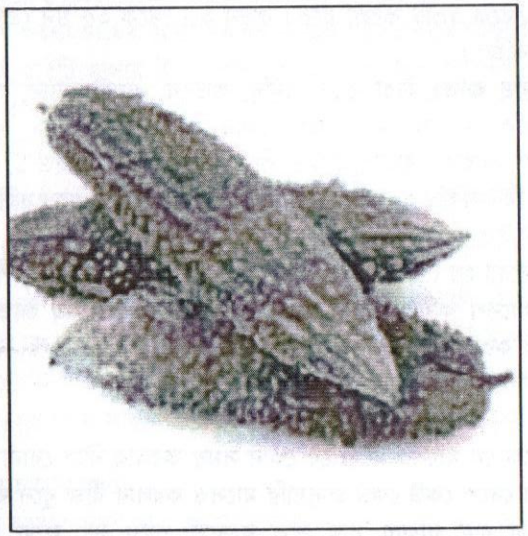

স্বাদে তেতো হলেও পুষ্টি ও ঔষধিগুণের জন্য করলা প্রসিদ্ধ। কচি ফলে প্রচুর পরিমান গ্রহণযোগ্য প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ থাকে। করলা সবজি হিসেবে খুব উপকারি। করলার স্বাদ তেতো হলেও করলা ডায়াবেটিস রোগীদের

পক্ষে খুবই উপকারি। করলা প্রায় সারাবছরই পাওয়া যায়। করলা খেতে তিতা হলেও খাদ্যমান, পেটের পীড়া ও অন্যান্য ঔষুধিগুণাবলির জন্য উপকারি। করলা বাত ও কৃমিনাশক। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ সবজির চাষ করা হয়ে থাকে।

জলবায়ু ও মাটি:

পানি বের হয় এমন বেলে দোআঁশ, দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটি করলা চাষের উপযোগী। পরিবেশগতভাবে করলা একটি কষ্টসহিষ্ণু জাতের উদ্ভিদ। উচ্চ আর্দ্র আবহাওয়ায় করলা ভালো জন্মে। করলা জলাবদ্ধতা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়ায় করলা ভালো জন্মে। বৃষ্টিপাত করলার জন্য খুব একটা ক্ষতিকর না হলেও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত পরাগায়নে বিঘ্ন ঘটায়।

জাত পরিচিতিঃ

উচ্ছে ও করলা পরপরাগায়িত সবজি হওয়ায় এর জাত বৈচিত্র্যের শেষ নেই। এক জাত লাগালেও পরের বছর সে জাত থেকে রাখা বীজ লাগিয়ে হুবহু একই বৈশিষ্ট্যের ফল পাওয়া যায় না। তাই প্রতি মৌসুমেই বিশ্বস্ত উৎস থেকে ভালো জাতের ভালো বীজ সংগ্রহ করে এর চাষ করা উচিত। উচ্ছের প্রায় সব জাতই দেশি বা স্থানীয়। চাষিরাই এগুলোর বীজ রাখেন ও লাগান। এ দেশে করলার যেসব জাত রয়েছে সেগুলো হলো- বিএডিসির 'গজ করলা' নামে একটি জাত আছে। এ জাতও ভালো, গাছপ্রতি ১৫ থেকে ২০টি করলা ধরে। ফলন ২০ থেকে ২৫ টন (প্রতি শতকে ৮০ থেকে ১০০ কেজি)।

করলার হাইব্রিড জাতঃ হীরা ৩০৪, মিনি, গুডবয়, ওয়াইজম্যান, জাম্বো, গজনি, ইউরেকা, হীরক, মানিক, মণি, জয়, কোড-বিএসবিডি ২০০২, বুলবুলি, টিয়া, প্যারট, কাকলি, প্রাইম-এক্সএল, টাইড, গ্রিন স্টার, গৌরব, প্রাইড ১, প্রাইড ২, গ্রিন রকেট, কোড-বিএসবিডি ২০০৫, পেন্টাগ্রিন, ভিভাক, পিয়া, এনএসসি ৫, এনএসসি ৬, রাজা, প্রাচী ইত্যাদি।

করলা দুই প্রকারের হয়। যথা–চৈতালী বা গ্রীষ্মের করলা ও পৌষালী বা শীতের করলা। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত হলো– বারি করলা-১, বারি করলা-২ এবং বারি করলা-৩।

করলার চাষপ্রযুক্তি ঃ

চাষের সময়ঃ

ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে যে কোন সময় করলার বীজ বোনা যেতে পারে। তবে আমাদের দেশে কেউ কেউ জানুয়ারি মাসেও করলার বীজ বুনে থাকেন কিন্তু এ সময় তাপমাত্রা কম থাকায় গাছ দ্রুত বাড়তে পারে না, ফলে আগাম ফসল উৎপাদনে তেমন সুবিধাজনক হয় না। তবে এ সময় পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে আশাব্যঞ্জক ফলন পাওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে বছরের যে কোন সময় অর্থাৎ শীতের দুই এক মাস বাদ দিয়ে সারাবছরই করলার চাষ হচ্ছে।

জমি তৈরি ঃ

ভাল করে চারবার চাষ দিয়ে গোবর পঁচা সার ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়। লতানো সবজির জন্য যে রাসায়নিক সার লাগে তা মিশিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। জমিকে ৮ ফুট চওড়া করে ভাগ করে নিতে হয়। ভাগের পাশে নালা রাখতে হয়। মাদা ৫ ফুট অন্তর অন্তর করতে হয়। বীজতলার সারির দূরত্ব ৫ ফুট আর চারার দূরত্বও ৫ ফুট হবে।

বীজ হার ঃ হেক্টরপ্রতি বীজের প্রয়োজন হয় ৬-৭ কেজি।

বীজ বোনার সময়:

গ্রীষ্মকালে: গ্রীষ্মের ফসলের জন্য পৌষ-ফাল্গুন মাসে মাদায় বীজ বোনা হলে মাদা শুকনো খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

বর্ষাকালে: বর্ষার করলার বীজ জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে বোনা হয়।

জমি তৈরি ও বীজ বপন পদ্ধতি ঃ

করলার বীজ সরাসরি মাদায় বোনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন করতে হবে অথবা পলিব্যাগে (১০-১৫ সেন্টিমিটার) ১৫-২০ দিন বয়সের চারা উৎপাদন করে নেওয়া যেতে পারে। খরিপ মৌসুমে যেখানে পানি জমার সম্ভাবনা নেই এমন স্থান করলা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। বসতবাড়িতে করলার চাষ করতে হলে দুই চারটি মাদায় বীজ বোনা যেতে পারে তবে গাছ যেন বেয়ে উঠতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে প্রথম দুই হাত চওড়া আইল করে আইলে মাদা করতে হবে।

সারি থেকে সারির দূরত্ব: সারি থেকে সারির দুরত্ব হবে ১৫০ সেন্টিমিটার।

গাছ থেকে গাছের দূরত্ব: গাছ থেকে গাছের দুরত্ব হবে ১০০ সেন্টিমিটার।

মাদায় মাটির অল্প নিচে বীজ বুনতে হয়। মাদায় চারা গজালে একটি সবল চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে। বীজের চারা বেশ শক্ত তাই চারা গজাতে সময় লাগে। বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে বুনলে তাড়াতাড়ি চারা গজায়। প্রয়োজন অনুযায়ী হাল্কা সেচ দিয়ে মাদার মাটিতে উপযুক্ত পরিমানে রস রাখতে হবে।

বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য:

বাণিজ্যিকভাবে করলা চাষের জন্য প্রথমে সম্পূর্ণ জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয় যাতে শিকড় সহজেই ছড়াতে পারে। আর যদি জমি বড় হয় তাহলে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে লম্বায় কয়েক ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। বেডের প্রশস্ততা হবে ১ মিটার এবং দুই বেডের মাঝে ৬০ সেন্টিমিটারের মতো নালা থাকবে।

সার প্রয়োগঃ

করলার জমিতে হেক্টর ও শতাংশ প্রতি নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	সারের পরিমান		জমিতে গর্ত তৈরির সময়	
	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি
গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	সব	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১৭৩ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-
টিএসপি	১৭৩ কেজি	৭০০ গ্রাম	সব	৩৫০ গ্রাম
এমপি	১৪৮ কেজি	৬০০ গ্রাম	৭৪ কেজি	৩০০ গ্রাম
জিপসাম	৯৯ কেজি	৪০০ গ্রাম	সব	৪০০ গ্রাম
জিঙ্ক অক্সাইড	১২ কেজি	৫০ গ্রাম	সব	৫০ গ্রাম
বোরাক্স	-	৪০ গ্রাম	সব	৪০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম	১২ কেজি	৫০ গ্রাম	সব	৫০ গ্রাম
সার	২০ দিন পর		৪০ দিন পর	
	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি
গোবর	-	-	-	-
ইউরিয়া	৫৮ কেজি	২৩৩ গ্রাম	২৮ কেজি	২৩৩ গ্রাম
টিএসপি	-	-	-	-
এমপি	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম
জিপসাম	-	-	-	-
জিঙ্ক অক্সাইড	-	-	-	-
বোরাক্স	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম	-	-	-	-

সার	৬০ দিন পর	
	হেক্টর প্রতি	শতাংশ প্রতি
গোবর	-	-
ইউরিয়া	৫৭ কেজি	২৩৩ গ্রাম
টিএসপি		
এমপি	২৪ কেজি	১০০ গ্রাম
জিপসাম	-	-
জিঙ্ক অক্সাইড	-	-
বোরাক্স	-	-
ম্যাগনেসিয়াম	-	-

বি.দ্রঃ সার প্রয়োগের পর হাল্কা পানি সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যাঃ

মনে রাখতে হবে জমিতে ভালো ফলন পেতে হলে চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয় ফলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া সম্ভব হয় না। সেচের পর জমিতে চটা বাঁধলে গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল করতে পারে না। ফলে প্রতি সেচের পর গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। যদি বেশি খরা হয় তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে জমিতে পানির অভাব দেখা দিলে চারার বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং পরবর্তীতে ফুলও ঝরে যায়। সে কারণে চারা ২০-২৫ মিটারের মতো উঁচু হলেই বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ১.০-১.৫ মিটার উঁচু মাচা তৈরি করে দিতে হবে। কারণ মাটিতে বাড়তে দিলে ফলন ভালো হয় না।

ফসল সংগ্রহ:

স্ত্রী ফুলের পরাগায়নের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায় তাই এ সময় ফল সংগ্রহ করা যেতে পারে। আর ফল একবার আহরণ করা শুরু হলে তা দুই মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়।

উচ্ছের পোকামাকড় দমন ও বালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

মাছি পোকা:

কীড়া ফলের নরম অংশ খেয়ে ফল নষ্ট করে দেয়। প্রতিকারের জন্য মাছি পোকা দমনের জন্য বিষ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। (ঢাকনা সহ স্বচ্ছ প্লাষ্টিক পাত্রে জানলা কেটে বা ছোট ছোট মাটির পাত্রে ১০০ গ্রাম থেতলানো ফলসহ কিছু পানি বা চিটাগুড় এর সাথে ০.৫ গ্রাম ডিপটেরেক্স ৮০ এসপি বা ১৫ ফোঁটা যে কোন বালাইনাশক ব্যবহার করা) ডিপটেরেক্স ৫০ ইসি ১.০ মি.লি বা ২ মি.লি সবিক্রণ প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

জাবপোকা/জ্যাসিড ঃ

এ পোকা কচি ডগা ও পাতার রস শুষে খেয়ে নেয় ফলে গাছের পাতার সমুহ ক্ষতি হয়ে পাতা হলুদ হয়ে যায়। প্রতিকারের জন্য জৈব বালাইনাশক (নিমবিসিডন) ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রমণের মাত্রা খুব বেশি হলে এসাটাফ ০.৫ এবং ১ গ্রাম ও ইমিডাক্লোরপিড (এমিটাফ, টিডো, এডমায়ার ০.৫ মি.লি) প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কাঁঠালে পোকা:

পূর্ণ বয়স্ক বিটল ও গ্রাব উভয়ই পাতার বেশ ক্ষতি করে থাকে। পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত পাতাগুলি বিবর্ণ জালের মতো দেখা যায়। পরে পাতা শুকিয়ে যায় এবং পাতা ঝরে পড়ে। প্রতিকারের জন্য সব করলার ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। করলার ক্ষেত থেকে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। আক্রমণের

মাত্রা বেশি দেখা দিলে ২ গ্রাম কারবারিল (সেভিন) বা ২ মি.লি ফেনিট্রোথিয়ন (সুমিথিয়ন/ফলিথিয়ন) প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পাউডারী মিলডিউ রোগঃ

এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের আক্রমণে পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের আবরণ দেখা যায়। প্রতিকারের জন্য বীজ সংগ্রহের সময় আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না। ১-২ গ্রাম সিকিউর বা ম্যানকোজেব-২ গ্রাম বা রিডোমেল গোল্ড-২ গ্রাম ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

করলার পাতা গুচ্ছ রোগ

আক্রান্ত গাছের পাতাগুলো গুচ্ছাকারে হয়ে যায়। ফুল ও ফল কমে যায় এবং গাছের বাড় বাড়তি থাকে না। জ্যাসিড পোকা দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। প্রতিকারের জন্য এ রোগে আক্রান্ত গাছ দেখামাত্রই তুলে ফেলতে হবে। ক্ষেতের আশেপাশের আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে এবং রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। টেট্রাসাইক্লিন বা লেডার মাইসিন (৫০০ পিপিএম) ছিটিয়ে রোগ দমন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বাহক পোকা ধ্বংস করার জন্য এসাটাফ, টিডো, এডমায়ার ইত্যাদি বালাইনাশক ছিটানো যেতে পারে।

পরিচর্যা ঃ

করলা চাষ করতে গেলে বেশি করে সেচের দরকার হয়। সে জন্য ৪/৫ দিন অন্তর অন্তর সেচ দিতে হয়। করলার জন্য মাচা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।

ফসল সংগ্রহঃ

আগাম জাতের বীজ লাগানোর একমাস পরই গাছে ফুল ধরা শুরু হয়। স্ত্রী ফুলের পরাগায়নের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। রোগাক্রান্ত না হলে বড় করলার গাছ ২-৩ মাসব্যাপী ফল দিতে থাকে। করলা কাঁচা অবস্থায় তুলতে হয়। পেকে গেলে সবুজ রঙ হলদে হয়ে যায়। করলা একদিন অন্তর তুলতে হয়। আজকাল সারাবছরই করলার চাহিদা দেখা যায়।

ফলন ঃ

করলা গাছঃ করলা গাছ ফল দেয়া শুরু করে ৬০ দিন পর। ফল আসা শুরু হলে গাছ থেকে প্রায় দুই মাস ফল তোলা যায়।

বড় করলাঃ ১০-১৫ টন/হেক্টর। করলার প্রতি গাছে প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি করলা পাওয়া যায়।

একরপ্রতি ৪,০০০ কেজি। এক একটি করলা প্রায় ১ ফুট পর্যন্ত হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবিধ

বাড়ির কাছাকাছি উঁচু এমনকি আধা ছায়াযুক্ত জায়গায় আদা হলুদের চাষ করতে পারেন। বাণিজ্যিকভিত্তিতে না হলেও পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনায়েসে একখণ্ড জমিতে আদা হলুদের চাষ করতে পারেন।

মাঠের মিষ্টি আলু, চিনাবাদাম বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই তুলে ফেলতে হবে। গ্রীষ্মকালীন মুগডালের চাষও এ মাসে করতে পারেন। পতিত বা আধা ছায়যুক্ত স্থানে সুযোগ থাকলে অনায়াসে লতিরাজ বা পানি কচু বা অন্যান্য উপযোগী কচুর চাষ করতে পারেন।

যারা সবুজ সার করার জন্য ধইঞ্চা বা অন্য গাছ লাগিয়ে ছিলেন তাদের চারার বয়স ৩৫-৪৫ দিন হলে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সবুজ সার মাটিতে মেশানোর ৭/১০ দিন পরই ধান বা অন্যান্য চারা রোপণ করতে পারবেন।

গাছপালা

আম, জাম, কাঁঠাল, লিচুসহ বিভিন্ন প্রকার ফল এ সময় পাঁকে। ফল সংগ্রহের সময় বিশেষ যত্ন নিতে হবে যাতে আঘাত না লাগে এবং বোটাসহ সংগ্রহ করতে হবে। আম সংগ্রহের পর ৪৩ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ৬% বোরাক্স মিশ্রণে ৩ মিনিট আম ডুবিয়ে রাখতে হবে। এতে আমের বোঁটা পচা রোগ হবে না।

আগামী মাসে চারা লাগানোর জন্য জায়গা নির্বাচন, গর্ত তৈরি ও গর্ত প্রস্তুতি, সারের প্রাথমিক প্রয়োগ, চারা নির্বাচন এ কাজগুলো এ মাসেই শেষ করে ফেলতে হবে। জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশি সতর্ক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে বহুমুখী উপকারি গাছ নির্বাচন বুদ্ধিমানের পরিচয় বহন করে।

উপযুক্ত মাতৃগাছ থেকে ভালবীজ সংগ্রহ করে নারকেল, সুপারির বীজ বীজতলায় এখন লাগাতে পারেন। এছাড়া পুরাতন ফলবাগানে বা ফল গাছে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হবে।

সুপ্রিয় পাঠক সংক্ষেপে আমরা জেনে নিলাম জৈষ্ঠ্য মাসের কৃষিতে আমাদের করণীয় দিকগুলো। আমাদের বিশ্বাস সুষ্ঠভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নে আপনাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি নিতে এগুলো বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। এরপরও যদি আরও নতুন কোন তথ্য প্রযুক্তি বা কৌশল জানার থাকে তাহলে স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি-মৎস্য-প্রাণি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা নিলে আরো বেশি লাভবান হবেন।

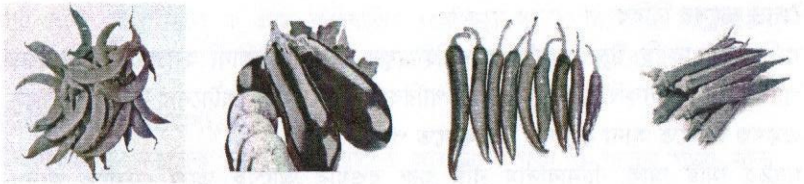

আষাঢ় মাসের কৃষি

(জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি)

গ্রীষ্মের তাপদাহে মানুষ, প্রকৃতি যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তখন নববর্ষার শিতল স্পর্শে ধরণীকে শান্ত, শীতল ও শুদ্ধ করতে বর্ষা ঋতু আসে আমাদের মাঝে। খাল-বিল, নদী-নালা, পুকুর, ডোবা ধীরে ধীরে ভরে ওঠে নতুন পানির জোয়ারে। গাছপালা ধুয়ে মুছে সবুজ হয়, কদমফুলের মনোহরি সুঘ্রাণ শোভা মাতিয়ে মন ভাল করে দেয় প্রতিটি বাঙালির। কৃষকের মনে দোলা দেয় এমন দিনে কী কী কাজ করা যায়। প্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন বর্ষার তন্ময়তার পর্দা সরিয়ে আসুন আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে জেনে নেই কৃষির করণীয় ভুবনের আবশ্যকীয় কাজগুলো।

গ্রীষ্মকালীন বেগুন, টমেটো, কাঁচা মরিচের পরিচর্যা, শিমের বীজ বপন, কুমড়া জাতীয় সবজির পোকামাকড়, রোগবালাই দমন। আগে লাগানো বেগুন, টমেটো ও ঢেঁড়সের বাগান থেকে ফসল সংগ্রহ। খরিফ-২ সবজির চারা রোপণ ও পরিচর্যা, সেচ ও সার প্রয়োগ। ফলসহ ঔষুধি গাছের চারা/কলম রোপণ, খুঁটি দিয়ে চারা বেঁধে দেয়া, খাঁচা/বেড়া দেয়া। ফল গাছে সুষম সার প্রয়োগ।

আউশ ধান

আউশ ধানের বাড়ন্ত পর্যায় এখন। এ সময় ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যত্ন নিতে হবে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ ও পোকামাকড় দমন করতে হবে। এ মাসে বন্যার সম্ভাবনা এবং প্রকোপ দুটোই বাড়ে। বন্যার আশঙ্কা হলে আগাম রোপণ করা আউশ ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকলেই কেটে মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

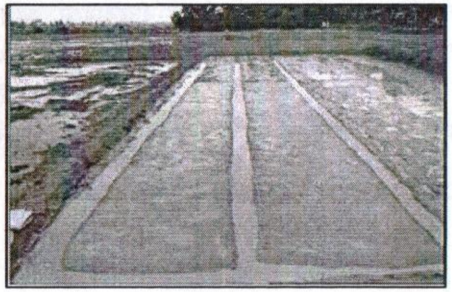

আমন ধান

আমন ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময় এখন। পানিতে ডুবে যায় না এমন উঁচু খোলা জমিতে বীজতলা তৈরি করতে হবে। বীজতলায় বীজ বপন করার আগে ভাল জাতের সুস্থ সবল বীজ নির্বাচন করতে হবে। রোপা আমনের উন্নত জাতগুলো হলো বিআর১০, বিআর২৫, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৭৯, ব্রি ধান৮০ ও ব্রি হাইব্রিড ধান৪। এছাড়া লবণাক্ত জমিতে ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৫৩ অথবা ব্রি ধান৫৪ ও ব্রি ধান৭৩ চাষ করতে পারেন। যে সব এলাকায় হঠাৎ বন্যার আশঙ্কা আছে সেখানে ব্রি ধান৫১ বা ব্রি ধান৫২ চাষ করতে হবে। খরা এলাকার জন্য খরা সহনশীল জাত ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭ বা ব্রি ধান৬৬ চাষ করতে হবে। এসব মানসম্মত বীজ আপনার কাছে না থাকলে বিএডিসি'র বীজ বিক্রয় কেন্দ্র, বিশ্বস্ত ডিলার বা অভিজ্ঞ চাষিভাইদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ভাল চারা পেতে হলে প্রতি বর্গমিটার বীজতলার জন্য ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ১০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।

আষাঢ় মাসে রোপা আমন ধানের চারা রোপণ শুরু করা যায়। অধিক ফলন পেতে হলে শেষ চাষের সময় হেক্টর প্রতি ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি দস্তা এবং ৬০ কেজি জিপসাম দিতে হবে। জমিতে চারা সারি করে রোপন করতে হবে। এতে ধানক্ষেতের পরবর্তী পরিচর্যা বিশেষ করে আগাছা দমন সহজ হবে।

পাট

পাট গাছের বয়স চার মাস হলে ক্ষেতের পাট গাছ কেটে নিতে হবে। পাট গাছ কাটার পর চিকন ও মোটা পাট গাছ আলাদা করে আঁটি বেঁধে দুই/তিন দিন দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। এত গাছের পাতা ঝরে যাবে। পাতা ঝরে গেলে ৩/৪ দিন পাটগাছগুলোর গোড়া এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর পরিষ্কার পানিতে জাগ দিতে হবে। জাগ দেওয়ার পর জাগের উপর কচুরিপানা বা খড় বিছিয়ে দিলে ভালো হয়। জাগ দেওয়ার পর নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখতে হবে যেন পাটের আঁশ খুব বেশি পচে না যায়। পাট পচে গেলে পানিতে আঁটি ভাসিয়ে আঁশ ছাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে পাটের আঁশের গুণাগুণ ভালো থাকবে। ছাড়ানো আঁশ পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে বাঁশের আড়ে শুকাতে হবে।

যে সমস্ত জায়গায় জাগ দেয়ার পানির অভাব সেখানে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাতে পারেন। এতে আঁশের মান ভাল হয় এবং পচন সময় কমে যায়। তবে মনে রাখতে হবে পাট কাটার সাথে সাথে ছালকরণ করতে হবে, তা না হলে পরবর্তীতে রৌদ্রে পাট গাছ শুকিয়ে গেলে ছালকরণে সমস্যা হবে।

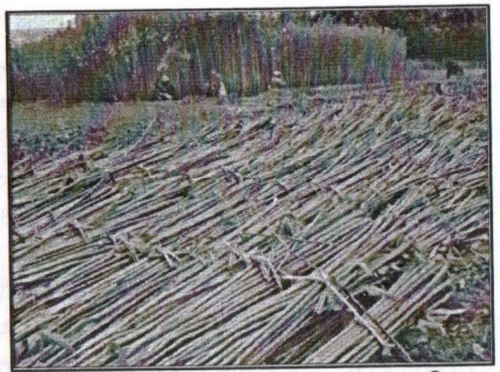

চাষিভাইরা ইচ্ছা করলে পাটের বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে পারেন। আষাঢ় মাসেই এ উদ্যোগ নেয়া দরকার। পাট গাছের বয়স ১০০ দিন হলে গাছের এক থেকে দেড় ফুট ডগা কেটে নিতে হবে। এসব ডগাকে আবার ৩/৪ টুকরা করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে প্রতি টুকরায় যেন দুটি গিট থাকে। এসব টুকরো ভেজা জমিতে দক্ষিণমুখী কাত করে রোপণ করতে হবে। রোপণ করা টুকরোগুলো থেকে ডালপালা বের হয়ে নতুন চারা হবে। পরবর্তীতে এসব চারায় প্রচুর ফল ধরবে এবং তা থেকে বীজ পাওয়া যাবে।

ভুট্টা

খরিফ ভুট্টার মোচা এখন সংগ্রহ করা যাবে। পরিপক্ক হওয়ার পর বৃষ্টিতে নষ্ট হবার আগে মোচা সংগ্রহ করে ঘরের বারান্দায় রাখতে পারেন। রোদ হলে শুকিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর যদি মোচা পাকতে দেরি হয়, তবে মোচার আগা চাপ দিয়ে নিম্নমুখী করে দিলে বৃষ্টিতে মোচা নষ্ট হবে না।

শাক্‌সবজি

এ সময়ে উৎপাদিত শাকসবজির মধ্যে আছে ডাঁটা, গিমাকলমি, পুঁইশাক, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, ঝিঙা, শসা, ঢেঁড়স, বেগুন। এসব সবজির গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনে মাটি তুলে দিতে হবে। সবজি ক্ষেতে পানি জমতে দেয়া যাবে না। পানি জমে গেলে সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

লতানো সবজির দৈহিক বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যায়। সেজন্য বেশি বৃদ্ধি সমৃদ্ধ লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশের পাতা লতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে। কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোরবেলা হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে।

আগাম জাতের শিম এবং লাউয়ের জন্য প্রায় ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করতে হবে। মাদা তৈরির সময় গর্তপ্রতি ১০ কেজি

গোবর, ২০০ গ্রাম সরিষার খৈল, ২ কেজি ছাই, ১০০ গ্রাম টিএসপি ভালভাবে মাদার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর প্রতি গাদায় ৩/৪টি ভাল সবল বীজ রোপণ করতে হবে। বর্ষায় পানি যেন মাদার কোন ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্ভব হলে মাচার ব্যবস্থা করতে হবে।

চিচিঙ্গার চাষপদ্ধতি

চিচিঙ্গা দেখতে সাপের মতো লম্বা, আঁকাবাঁকা ও ডোরাকাটা বলে ইংরেজিতে একে Snake gourd বলে। চিচিঙ্গার চাষ যেমন সহজ তেমন খরচও কম। এতে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন 'এ' ও 'সি' প্রভৃতি প্রচুর খাদ্যগুণ রয়েছে।

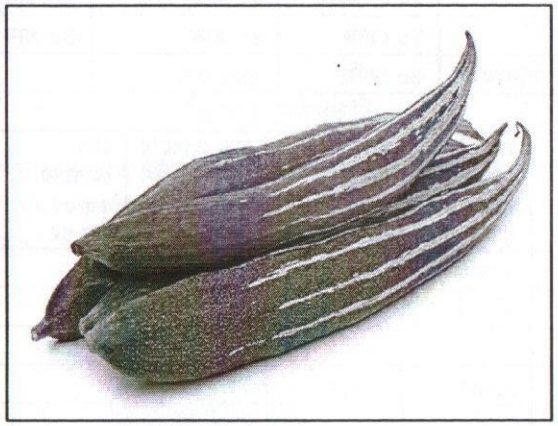

জাত ঃ

বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত- বারি চিচিঙ্গা-১। এ ছাড়াও অন্যান্য আরো জাত রয়েছে।

চিচিঙ্গার চাষপ্রযুক্তি ঃ

জমি তৈরি ঃ

চিচিঙ্গার জমি তৈরি করার জন্য ৮ফুট চওড়া ভাগের মাপ করে সেচনালীর কাছে মাদা তৈরি করতে হবে। মাদার ব্যাস ১ ফুট হলে ভাল হয় এবং গভীরতা ৬ ইঞ্চি হলে ভাল হয়।

বীজ বোনার সময় ঃ কার্তিক থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বোনা যায়।

বীজ বপন পদ্ধতি ঃ

বীজ জমিতে ফেলার আগে ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং এরপর বীজ বুনতে হবে। বীজ থেকে চারা বের হতে ১০ দিন সময় লাগে। ৬ ফুট অন্তর অন্তর সারি তৈরি করতে হবে। গাছের দূরত্ব রাখতে হবে ৪ ফুট করে।

বীজ হার ঃ
প্রতি বীজতলায় ১২টি বীজ লাগবে। প্রতি কাঠায় বীজ লাগে ১৫ গ্রাম।

সার প্রয়োগ ঃ চিচিঙ্গার জমিতে নিম্নবর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে-

সারের নাম	মোট পরিমাণ (প্রতি হেক্টরে)	মোট পরিমাণ (প্রতি শতাংশে)	জমি তৈরির সময় (প্রতি শতাংশে)
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	৪০ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৬০ কেজি	২৪০ গ্রাম	-

এবং

সারের নাম	চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	২ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	১৮ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	-	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	৫ গ্রাম
এমপি	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	-	-	-	-	-
দস্তা সার	-	-	-	-	-
বোরাক্স	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	১২ গ্রাম	-	-	-	-

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ
মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে 'জো' এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

পরিচর্যা ঃ
চিচিঙ্গা গাছ লতানে গাছের মতো হয়। তাই গাছ লতাতে থাকলে গাছের উপর ৪ ফুট মাচা তৈরি করে দিতে হয় বাঁশ ও কঞ্চি দিয়ে। গাছের সঙ্গে লাঠি পুঁতে দিলে

সেটা বেয়ে মাচার উপরে ওঠে। লতানো গাছ বাড়ির চালে তোলা যায়। যেসব পাতা হলদে হবে বা শুকিয়ে যাবে সেগুলো তুলে ফেলতে হবে। গরমের জন্য ৪/৫ দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার।

ফসল সংগ্রহ:
বীজ বোনার ২ মাসের ভিতর চিচিঙ্গায় ফল ধরা শুরু হয়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত না হলে গাছ ২ মাসের অধিক সময় ধরে ফল দিয়ে থাকে। সাত থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে গাছে ফল দেখা দেয়। চিচিঙ্গা তাড়াতাড়ি ফলে। প্রায় দেড় মাস ধরে ফল পাওয়া যায়।

ফলন ঃ
প্রতি গাছ থেকে ২০-২৫ টি ফল পাওয়া যায়। হেক্টরপ্রতি ১০-১৫ টন চিচিঙ্গা পাওয়া যায়। কাঠাপ্রতি ৭৫-৯০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

ঝিঙ্গের চাষপদ্ধতি

ঝিঙ্গে সবজি হিসেবে অতি পরিচিত। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ঝিঙ্গের চাষ করা যায়। আমাদের দেশে ঝিঙ্গে খুবই জনপ্রিয়। এতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন-সি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ বর্তমান।

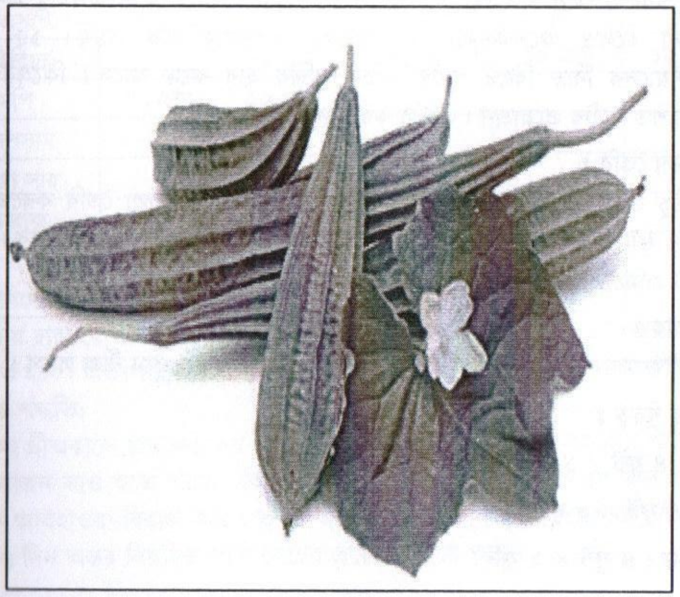

জাত ঃ

বাংলাদেশে ঝিঙ্গের অনেক জাত রয়েছে। ফলের গঠন ও স্বাদের দিক থেকে জাতসমুহের মধ্যে প্রচুর ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সব জাতই নামবিহীন। সম্প্রতি আমাদের দেশে ঝিঙ্গার দুটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে।

যথা: বারি ঝিঙ্গা-১ ও বারি ঝিঙ্গা-২।

এ ছাড়াও ঝিঙ্গের আরোও কিছু জাত রয়েছে। যেমন-

উন্নত: পুসা নাসধর, সাতপুতিয়া, বারোপাতা, বর্ষাতি, পুসা চিকনী ইত্যাদি।

হাইব্রিড: সুরেখা, রোহিনী, সুদর্শনা, এন.এস-৩, ঐরাবত ইত্যাদি।

এছাড়াও বিভিন্ন জাতের ঝিঙ্গে হয়। যেমন-

বর্ষাতি বা পালা ঝিঙ্গে–এই ঝিঙ্গে বৈশাখ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত বোনা হয়। পালা বা মাচায় একই ঝিঙ্গে হয় বলে একে পালা ঝিঙ্গে বলে।

চৈতে বা ভুঁইয়ে ঝিঙ্গে–চৈতে ঝিঙ্গের বীজ বপন করা হয় মাঘ মাসে। একে বারো-পাতা ঝিঙ্গে বলে। এর গাছ মাটিতেই লাতিয়ে যায়। এর জন্য মাচা লাগে না।

পুশা লস্ধর্ ঝিঙ্গে–এই ঝিঙ্গে উন্নতমানের।

ঝিঙ্গের চাষপ্রযুক্তিঃ

মাটি ও জলবায়ু ঃ

ঝিঙ্গে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভাল জন্মে। ঝিঙ্গে প্রধাণত আর্দ্র জলবায়ু এলাকায় জন্মানো হলেও অপেক্ষাকৃত শুষ্ক স্থানেও এগুলোর চাষ সম্ভব। ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে ঝিঙ্গে গাছে দৈহিক বৃদ্ধির হার কমে আসে। ঝিঙ্গের জন্য সুনিষ্কাশিত মাটির প্রয়োজন। এগুলি কষ্টসহিঞ্চু উদ্ভিদ।

বীজতলা তৈরি ঃ

অল্প উঁচু জমি, ৮ ফুট চওড়া জমির নালার কাছাকাছি বীজতলা তৈরি করতে হবে এবং ৪ ফুট অন্তর সারি দিতে হবে। চারার মধ্যে ৫ ফুট দূরত্ব রাখতে হবে। ১০০ বর্গফুট জমিতে তিনটি বীজতলা করতে হবে।

বীজ হার ঃ

প্রতি বীজতলায় ৪টি করে ১২টি বীজ লাগে। কাঠা প্রতি ২৫ গ্রাম বীজ লাগে।

বোনার দুরত্ব ঃ

গ্রীষ্ম : ৪ ফুট × ১.৫ ফুট।

বর্ষা: ৪ ফুট × ২ ফুট।

হাইব্রিড : ৪ ফুট × ২ ফুট।

সার প্রয়োগঃ সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি (শতকপ্রতি ১২টি মাদা হিসেবে)

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টরে)	মোট পরিমাণ (শতাংশে)	জমি তৈরির সময় (শতাংশে)
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	২০ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৬০ কেজি	২৪০ গ্রাম	-

সারের নাম	মাদা প্রতি				
	রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	রোপণের ১০-১৫ দিন পর	রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	৫ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	৩০ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	-	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম
এমপি	২০ গ্রাম	১৫ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	-	-	-	-	-
দস্তা সার	-	-	-	-	-
বোরাক্স	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	১০ গ্রাম	-	-	-	-

মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে জোঁ এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

সেচ পদ্ধতি:

ঝিঙ্গা গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়। তাই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় বলে সবসময় পানি সেচের প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষ সময় থেকে মে মাস পর্যন্ত খুব শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। তখন অনেক সময় কোন বৃষ্টিই থাকে না। উক্ত সময়ে ৫-৬ দিন অন্তর নিয়মিত পানি সেচের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বাউনি দেওয়াঃ
ঝিঙ্গা মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে এর বাজারদর কমে যায়। ফলে অনেক সময় পচনও ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কম হয়। তাই ঝিঙ্গার কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচার ব্যবস্থা করতে হবে।

মালচিংঃ
জমিতে সেচ দেওয়ার পর জমির মাটিতে চটা বাঁধে যার ফলে শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল করতে পারে না। কাজেই প্রতিটি সেচের পর হাল্কা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

পরিচর্যাঃ
চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ করা পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া নাও যেতে পারে। চারা রোপণের পর গাছপ্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সময়মতো গাছের গোড়ায় শোষক শাখা অপসারণ করলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

ফসল সংগ্রহঃ
ভালো ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে ২-৩ মাসব্যাপি ফল সংগ্রহ করা যায়। তবে ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখালে তা সংগ্রহের উপযোগী হয়। বীজ বোনার ৪৫-৬০ দিন পর থেকে ঝিঙ্গায় ফল ধরা শুরু হয় এমনকি ঝিঙ্গা গাছ ২-৩ মাসব্যাপি ফল দিতে থাকে। স্ত্রী ফল পরাগায়িত হওয়ার ৮-১০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। প্রতি গাছে ৩০ থেকে ৪০টি ঝিঙে হয়।

ফলন ঃ
উন্নত জাতঃ হেক্টরপ্রতি ২০-৩০ টন।

শসার চাষ পদ্ধতি

সবজির চেয়ে কাঁচা ফল হিসেবে শসার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। পাকা শসা অবশ্য তরকারি হিসেবে ব্যবহার হয়। কচি শসা কাঁচা খাওয়া যায়। শসা খুবই মুখরোচক। শসার জন্য রোদের খুব প্রয়োজন হয়। ছায়া ঢাকা স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে শসা ভালো হয় না। শসার উৎপাদন আমাদের দেশে খুব বেশি না হলেও সারাবছরই বাজারে শসা পাওয়া যায়। শসা সালাদ ও সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।

আমাদের দেশে শসা সাধারণত দুই ধরণের এক হলো ভুঁইয়ে শসা আর একটি হলো পালা শসা। ভুঁইয়ে শসা চৈতি ও গ্রীষ্মকালের শসা, অগ্রহায়ন থেকে এর বোনা হয় আর ফাল্গুন পর্যন্ত চলে। এর গাছ মাটির উপরে লতিয়ে যায় এবং ফলের আকার

অপেক্ষাকৃত ছোট। পালা বা বর্ষাতি শসার বীজ জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় মাসে বোনা হয়। এই শসার গাছ খুব বড় হয়। সেজন্য মাচার বা ডালের দরকার হয়। এই শসা আকারে বেশ লম্বা হয়।

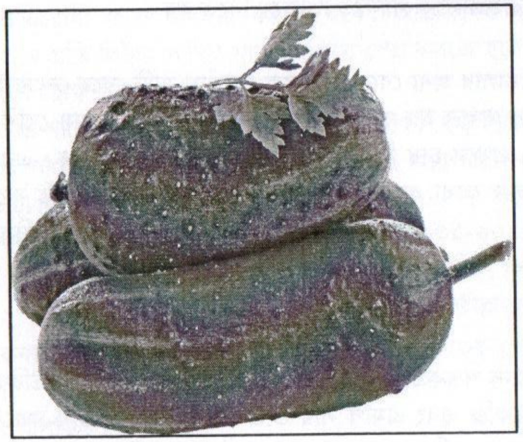

শসার জাত ঃ
উফশী জাত- রত্না, শীলা, গ্রীণ কিং, বারোমাসি, গ্রীণ জয়েন্ট, জ্যোতি ইত্যাদি।
হাইব্রীড জাত– হীরা-৯০৪, ডেভী-২২৩১, বুলবুল, নীনজা, নাইস গ্রীন, ডাইনেষ্টি, বিউটি ফুল, আলাভী, তিতুমির, এভারগ্রীন, হিমেল প্রভৃতি।

এছাড়াও গোল বা বেঁটে জাত, দেশি পালা শসা, কার্তিকে শসা, রত্না ইত্যাদি জাত পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশে সাধারণত বেশি চাষ হয় দুই রকমের শসা। যথা–

১. পালা বা বর্ষাতি শসা ও
২. চৈতে বা ভুঁইয়ে শসা।

শসার চাষপ্রযুক্তি ঃ
বীজ বোনার সময় ঃ
পালা বা বর্ষাতি শসার ক্ষেত্রে
পালা বা বর্ষাতি শসার বীজ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বোনা হয়। এর বীজ বীজতলায় বোনা হয়। ২/৩টি শসার জন্য একটি বীজতলা তৈরি করতে হয়। গাছ লতাতে শুরু করলে মাচা তৈরি করে দিতে হবে। শ্রাবণ থেকে আশ্বিন-কার্তিক মাস পর্যন্ত ফলন দেয়। শরৎকালে শিশির পড়তে থাকলে গাছ শুকিয়ে যায়।

চৈতে বা ভুঁইয়ে শসার ক্ষেত্রে ঃ
চৈতে শসার বীজ চৈত্র মাসে বীজতলায় বোনা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ফল ফলতে শুরু করে। এই জাতীয় শসা মাটিতে লতিয়ে থাকে। জমি শুকনো ও আগাছামুক্ত

হওয়া দরকার। বর্ষা শুরু হলে মাটি ভিজে যায় তাই বর্ষার আগেই ফল তুলে ফেলতে হয়। জমিতে ৪ ফুট উঁচু সারি তৈরি করে ৫ ফুট দূরে মাদা তৈরি করতে হয়। প্রতি মাদার জন্য ৪টি করে বীজ লাগে। একরপ্রতি আড়াই কেজির মতো বীজ লাগে। বোনার আগে বীজগুলিকে পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়।

জমি তৈরিঃ

জলদি ফসল তোলার জন্য বেলে বা বেলে দোআঁশ মাটি বেছে নেওয়াই উত্তম। উর্বর দোআঁশ মাটিতে ফলন হয় প্রচুর, তবে গাছ প্রথমে লতিয়ে যায় বেশি। ফলতে শুরু করে দেরিতে। প্রথমে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। এরপর বর্ষাতি বা পালা শসার জন্য আধা হাত উঁচু আইল করে আইল মাদা তৈরি করে বীজ বোনা হয়। আইল ১০০-১৫০ সেন্টিমিটার চওড়া, সারি থেকে সারির দূরত্ব ১২০ সেন্টিমিটার এবং সারিতে গাছের দূরত্ব ৯০ সেন্টিমিটার রাখা উচিত। তবে চৈতি বা খিরা শসার জন্য আইল তোলার প্রয়োজন হয় না।

সার প্রয়োগ ঃ

ভাল ফলনের জন্য শতকপ্রতি গোবর/জৈব সার ২০-২৮ কেজি, ইউরিয়া ০.৪ কেজি, টিএসপি ০.৬ কেজি এবং এমপি সার ০.৪ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে। আর যদি জমির পরিমাণ বেশি হয় তাহলে হেক্টরপ্রতি গোবর/জৈব সার ৫-৭ টন, ইউরিয়া ১০০ কেজি, টিএসপি ১৫০ কেজি এবং এমপি সার ১০০ কেজি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

শসার বিভিন্ন পোকামাকড় দমন ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনাঃ

শসার বিটল পোকাঃ

এ পোকা গাছের কচি পাতা ও ডগাকে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত অংশ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। প্রতিকারের জন্য হাত জাল দিয়ে এ পোকা ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে এবং ক্ষেতের আশে পাশের আগাছা নষ্ট করে ফেলতে হবে। এ পোকার আক্রমণ থেকে সাময়িক রক্ষা পাওয়ার জন্য পাতার উপর ছাই ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ গাছের চারা বের হওয়ার ২৫ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন-১ মি.লি, মিপসিন, সপসিন-২ মি.লি, একতারা-১মি.লি, সেভিন-২ গ্রাম হিসাবে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শসার মাছি পোকাঃ

এতে পোকা গাছের কচি ফলের খোসার ভিতর ডিম পাড়ে তারপর ফল খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। প্রতিকারের জন্য আক্রান্ত ফল দেখামাত্রই তা তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে। এ পোকা দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ডিপটেরেক্স ৫০ ইসি ১.০ মিলি বা ২ মিলি সবিক্রণ প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শসার পাউডারী মিলডিউ রোগ

এ রোগে পাতার উপরিভাগ সাদা পাউডার দিয়ে ভরে যায় এবং ফসল নষ্ট করে ফেলে। প্রতিকারের জন্য এ রোগে আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে থিয়োভিট-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শসার ঢলে পড়া রোগ

এ রোগে আক্রান্ত গাছের পোকা শিকড় নষ্ট করে দেয় ফলে শিকড় দিয়ে রস আর গাছের কাণ্ডে পৌছাতে পারে না। যার ফলে রসের অভাবে গাছ মরে যায়। প্রতিকারের জন্য এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে। বীজ সংগ্রহ করার সময় রোগমুক্ত গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বীজ শোধন করে নিতে হবে (প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ দ্বারা)। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ২ গ্রাম ক্যামপ্যানিয়ন বা ৪ গ্রাম কুপ্রাভিট বা কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় স্প্রে করা যেতে পারে।

শসার ডাউনি মিলডিউ রোগ

এ রোগে আক্রান্ত পাতার উপরে ছোট ছোট হলুদ ও কোণাকৃতি দাগ দেখা যায়। রোগের আক্রমণে বয়স্ক পাতা মারা যায়। প্রতিকারের জন্য এ রোগে আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ডাইথেন-এম-৪৫ ২.৫ গ্রাম এবং ম্যানকোজেব+মেটালেক্সিল-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শসার এ্যানথ্রাকনোজ রোগ

এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। প্রতিকারের জন্য এ রোগে আক্রান্ত গাছ দেখামাত্রই তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে। সুষম সার ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। বীজ শোধন করে নিতে হবে (ভিটাভেক্স ২০০ বি-২.৫ গ্রাম দ্বারা)। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে টপসিন এম ২.৫ গ্রাম বা নোইন-১ গ্রাম বা একোনাজল বা টিল্ট-০.৫ মি.লি বা চাম্পিয়ন-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পরিচর্যা ঃ

শসা আড়াই মাসে খাওয়ার উপযুক্ত হয়। এটি কাঁচা অবস্থায় খুব সুস্বাদু সবজি। পেকে গেলে কাঁচা খাওয়া যায় না, তরকারিতে ব্যবহার করা যায়। শসা চাষে অত্যন্ত যত্ন নিতে হয় না হলে পোকার সংক্রমণ ঘটতে পারে।

ফসল সংগ্রহঃ জাতভেদে বীজ বোনার ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়। শসা বেচতে হলে কাঁচা অবস্থায় গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হবে।

ফলনঃ হেক্টর প্রতি ১০-১৫ টন।

শ্রাবণ মাসের কৃষি

(জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি)

শ্রাবণের অথৈ পানিতে খালবিল, নদীনালা, পুকুর ডোবা ভরে যায়, ভাসিয়ে দেয় মাঠ-ঘাট, প্রান্তর এমনকি আমাদের বসত বাড়ির আঙ্গিনা। তিলতিল করে বিনিয়োগ করা কষ্টের কৃষি তলিয়ে যেতে পারে সর্বনাশা পানির নিচে। প্রকৃতি সদয় থাকলে ভাটির টানে এ পানির সিংহভাগ চলে যায় সমুদ্রে। কৃষি কাজে ফিরে আসে ব্যস্ততা। আর এ প্রসঙ্গে জেনে নেবো কৃষির বৃহত্তর ভুবনে কোন কোন কাজগুলো করতে হবে আমাদের। আগাম রবি সবজি যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, টমেটো, বেগুন এর বীজতলা তৈরি, বীজ বপন। খরিফ-২ এর সবজি উঠানো ও পোকামাকড় দমন। শিমের বীজ বপন, লালশাক ও পালংশাকের বীজ বপন। রোপণকৃত ফলের চারার পরিচর্যা, উন্নত চারা/কলম রোপণ, খুঁটি দেয়া, খাঁচি বা বেড়া দেয়া, ফল সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ।

আউশ

এ সময় আউশ ধান পাকে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পাকা আউশ ধান কেটে মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিতে হবে এবং বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ ধান হিসেবে সংরক্ষণ করতে হলে লাগসই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করলে ভাল বীজ পাওয়া যাবে।

আমন ধান

শ্রাবণ মাস আমন ধানের চারা রোপনের ভরা মৌসুম। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে জমিতে রোপন করতে হবে। রোপা আমনের আধুনিক এবং উন্নত জাতগুলো হলো বিআর ৩, বিআর ৮, বিআর ৫, বিআর ১০, বিআর ২২, বিআর ২৩, বিআর ২৫, ব্রিধান ৩০, ব্রিধান ৩১, ব্রিধান ৩২, ব্রিধান ৩৩, ব্রিধান ৩৪, ব্রিধান ৩৭, ব্রিধান ৩৮, ব্রিধান ৩৯, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৭৯, ব্রি ধান৮ ও ব্রি হাইব্রিড ধান৪, বিনাশাইল, নাইজারশাইল, বিনাধান ৪ এসব। এছাড়া উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকার জন্য ব্রিধান ৪০ এবং ব্রিধান ৪১, ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪ ও ব্রি ধান৭৩ চাষ করতে পারেন। আমন ধানের ক্ষেতে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য জমির উর্বরতা অনুসারে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপনের ১২-১৫ দিন পর প্রথমবার ইউরিয়া সার ক্ষেতে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। প্রথম উপরিপ্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর দ্বিতীয়বার এবং তার ১৫-২০

দিন পর তৃতীয়বার ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে চারা লাগানোর ১০ দিনের মধ্যে প্রতি চারগুছির জন্য ১৮ গ্রামের ১টি গুটি ব্যবহার করতে হবে। এজন্য চারা লাইনে রোপন করতে হবে। পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধানের ক্ষেতে বাঁশের কঞ্চি বা ডাল পুঁতে দিতে পারেন যাতে পাখি বসতে পারে এবং এসব পাখি পোকা ধরে খেতে পারে।

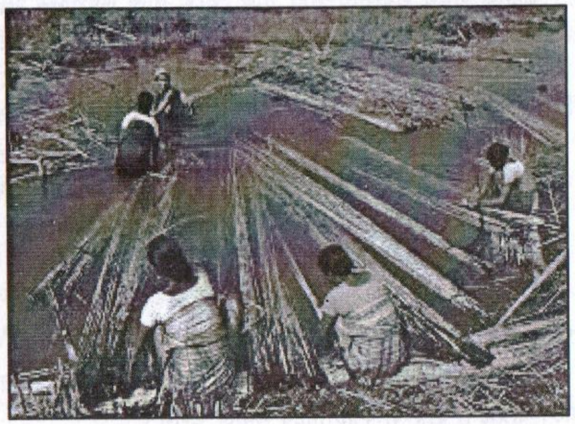

পাট

ক্ষেতের অর্ধেকের বেশি পাট গাছে ফুল আসলে পাট কাটতে হবে। এতে আঁশের মান ভাল হয় এবং ফলনও ভালো পাওয়া যায়। পাট পচানোর জন্য আটি বেধে পাতা ঝরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জাগ দিতে হবে। ইতোমধ্যে পাট পচে গেলে তা ছাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভালো করে ধোয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলে তাতে আঁশ ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, এতে উজ্জ্বল বর্ণের পাট পাওয়া যায়।

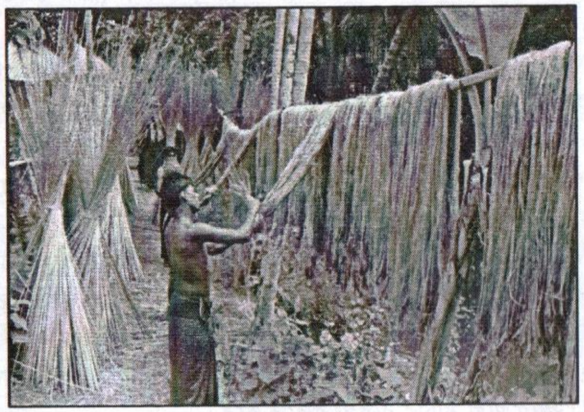

যে সমস্ত জায়গায় জাগ দেয়ার পানির অভাব সেখানে রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচাতে পারেন। এতে আঁশের মান ভাল হয় এবং পচন সময় কমে যায়। তবে মনে রাখতে হবে পাট কাটার সাথে সাথে ছালকরণ করতে হবে, তা না হলে পরবর্তীতে রৌদ্রে পাট গাছ শুকিয়ে গেলে ছালকরণে সমস্যা হবে।

বন্যার কারণে অনেক সময় সরাসরি পাট গাছ থেকে বীজ উৎপাদন সম্ভব হয় না। তাই এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পাটের ডগা বা কাণ্ড কেটে উচু জায়গায় লাগিয়ে তা থেকে খুব সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগা বা কাণ্ড ১৫-২২ সেন্টিমিটার উপর থেকে কেটে মাদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রতি টুকরায় পাতাসহ ৩-৪টি কুড়ি থাকে। এসব টুকরো ভেজা জমিতে দক্ষিণমূখী কাত করে রোপণ করতে হবে। রোপণ করা টুকরোগুলো থেকে ডালপালা বের হয়ে নতুন চারা হবে। পরবর্তীতে এসব চারায় প্রচুর ফল ধরবে এবং তা থেকে বীজ পাওয়া যাবে।

শাকসবজি

বর্ষাকালীন শাকসবজি তোলার ভরা মৌসুম এখন। আপনি যদি গত দুই মাসের শাকসবজির করণীয় কাজগুলো করে থাকেন তবে এখন দুই হাতে ফসল তোলার সময়। সাবধানে ধারালো ছুরি বা কাঁচি দিয়ে সবজি তুলুন।

ভবিষ্যতে বীজের জন্য সুস্থ সবল সুন্দর ফল নির্বাচন করে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। ফল পেকে গেলে সাবধানে বীজ সংগ্রহ করে ধুয়ে শুকিয়ে বোতলজাত করতে হবে। এ মাসে সবজি বাগানে করণীয় কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদায় মাটি দেয়া, আগাছা পরিষ্কার, গাছের গোড়ায় পানি জমতে না দেয়া, মরা বা হলুদ পাতা কেটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরিপ্রয়োগ করা।

লতানো সবজির দৈহিক বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যায়। সেজন্য বেশি বৃদ্ধি সমৃদ্ধ লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশের পাতা লতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে। কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুণভাবে সহায়তা করবে। গাছে ফুল ধরা শুরু হলে প্রতিদিন ভোরবেলা হাতপরাগায়ন নিশ্চিত করলে ফলন অনেক বেড়ে যাবে।

গত মাসে শিম ও লাউয়ের চারা রোপনের ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। আগাম জাতের শিম এবং লাউয়ের জন্য প্রায় ৩ ফুট দূরে দূরে ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করতে হবে। মাদা তৈরির সময় গর্তপ্রতি ১০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম সরিষার খৈল, ২ কেজি ছাই, ১০০ গ্রাম টিএসপি ভালভাবে মাদার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর প্রতি মাদায় ৩/৪টি ভাল সবল বীজ রোপণ করতে হবে। বর্ষায় পানি যেন মাদার কোন ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্ভব হলে মাচার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছপালা

এখন সারা দেশে গাছ রোপনের কাজ চলছে। ফলজ, বনজ এবং ওষুধি বৃক্ষজাতীয় গাছের চারা বা কলম রোপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে এক হাত চওড়া এবং এক হাত গভীর গর্ত করে অর্ধেক মাটি এবং অর্ধেক জৈব সারের সাথে ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। সার ও মাটির এ মিশ্রণে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। দিন দশেক পরে গর্তে চারা বা কলাম রোপন করতে হবে। ভাল জাতের স্বাস্থ্যবান চারা রোপন করতে হবে। চারা রোপণের পর গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে এবং খুটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিতে হবে।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাস আমাদের কৃষির জন্য হুমকির মাস। এ কথা যেমন সত্য, তারচেয়ে বেশি সত্য আমাদের সবার সম্মিলিত, আন্তরিক ও কার্যকরি সতর্কতা এবং যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এ দুর্যোগের মোকাবেলা করা সম্ভব। কৃষিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে আধুনিক কৃষি কৌশল যেমন অবলম্বন করতে হবে তেমনি সকল কাজ করতে হবে সম্মিলিতভাবে। তাহলে দেখবেন কৃষির সফলতায় শুধু আপনিই উদ্ভাসিত নন, উদ্ভাসিত দেশের কৃষি এবং পুরো দেশ।

কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরির পদ্ধতিঃ

এটি একটি পরিবেশবান্ধব সার। এক মাসের বাসী গোবর বা তরিতরকারির ফেলে দেওয়া অংশ, ফলমূলের খোসা, উদ্ভিদের লতাপাতা, পশুপাখির নাড়িভুঁড়ি হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, ছোট ছোট করে কাটা খড়কুটো খেয়ে কেঁচো মল ত্যাগ করে এবং এর সাথে কেঁচোর দেহ থেকে এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ বের হয়ে যে সার তৈরি হয় তাঁকে কেঁচো কম্পোস্ট বা ভার্মি কম্পোস্ট বলা হয়। কেঁচো সার একটি জৈব সার। এই সার জমির উর্বরতা বাড়াতে ব্যবহার করা হয়। এই সার সব ধরণের ফসল ক্ষেতে সহায়তা করে। এটি পৃথিবীতে অধিক ব্যবহৃত জৈব সারের মধ্যে অন্যতম।

তৈরির উপাদানঃ

অন্যান্য কম্পোস্টের চেয়ে কেঁচো কম্পোস্টে প্রায় ৭-১০ ভাগ পুষ্টিমান বেশি থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে একটি আদর্শ ভার্মিকম্পোস্টে থাকে-

নাম	পরিমান
নাইট্রোজেন	১.৫৭ %
ফসফরাস	১.২৬ %
পটাশ	২.৬০ %
সালফার	০.৭৪ %
ম্যাগনেসিয়াম	০.৬৬ %
বোরণ	০.০৬ %

নাম	পরিমান
জৈব কার্বন	১৮ %
পানি	১৫-২৫ %
হরমোন	সামান্য পরিমান

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

কম্পোস্ট সার তৈরি করার জন্য কচুরীপানা, ফসলের অবশিষ্টাংশ, সবজি বা ফলের খোসা, আগাছা, বসতবাড়ির ময়লা আবর্জনা ও খড়কুটা প্রয়োজন। এছাড়া প্রধান উপকরণ হলো কেঁচো-২০০০ টি, মাটির তৈরি নালা বা চাড়ি অথবা ইট দিয়ে নির্মিত চৌবাচ্চা এবং এক মাসের বাসী গোবর।

সার তৈরির পদ্ধতি/ধাপঃ

প্রথম ধাপ: কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করতে হলে প্রথমে গর্ত তৈরি করতে হবে। এরপর এসব গর্তে ঘাস, আমের পাতা বা খামারের ফেলে দেয়া অংশ এসবের যে কোনো একটি ছোট ছোট করে কেটে এর প্রায় ২৫ কেজি হিসেবে নিতে হয়। তবে এসব আবর্জনা গর্তে ফেলার আগে গর্তের তলদেশসহ চারপাশে পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হবে। যার ফলে গর্তের কেঁচো পিট থেকে বাইরে বের হয়ে যেতে পারবে না।

দ্বিতীয় ধাপ: দ্বিতীয় ধাপে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির জন্য প্রথমেই পলিথিন বিছানোর পরে গর্তের নিচে ৬ ইঞ্চি পুরু করে বেড বানাতে হবে। এই বেড তৈরির জন্য ভালো মাটি ও গোবর সমপরিমাণে মিশাতে হবে এবং এসব মিশানো গোবর ও মাটি পরে কেঁচোর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় ধাপ: দুই ধরণের কেঁচো দেখতে পাওয়া যায়। যথা- এপিজিক ও এন্ডোজিক। এপিজিক জাতের কেঁচো মাটির উপরেই থাকে। এরা দেখতে হয় লাল রঙের। এদের দিয়ে কম্পোস্ট বা কেঁচো সার তৈরি করা যায়। আর একটি হলো এন্ডোজিক কেঁচো। এরা দেখতে ছাই রঙের হয়ে থাকে। এরা কেঁচো সার বা কম্পোস্ট সার উৎপাদন করতে পারে না তবে এরা মাটির ভৌত ও জৈব গুণাবলির উন্নতি করতে পারে।

চতুর্থ ধাপ: চতুর্থ ধাপে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির জন্য গোবর ও মাটি দিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে তারপর ২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১ মিটার প্রস্থ মাপের পিটে ৫০০ টি কেঁচো প্রয়োগ করতে হয়। কেঁচো প্রয়োগের পর ২ ইঞ্চি জৈব সার এবং তার উপর ৪ ইঞ্চি কাঁচা পাতা দিতে হবে। গর্তের উপরিভাগ পাটের ভিজানো চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং প্রতিদিন দুইবার করে পানি ছিটাতে হবে। যখন কাঁচা পাতা কালো বর্ণ ধারণ করবে তখন পানি দেয়া বন্ধ করতে হবে। চার সপ্তাহ পরে আবার কাঁচা পাতা দিয়ে চট দিয়ে ঢেকে ভিজাতে হবে। এরপর ৪ দিন পর পর কাঁচা পাতা দিতে হবে। ৬ সপ্তাহ পরে নেটে চেলে কেঁচো আলাদা করে সার ব্যবহার বা বাজারজাত করা যাবে।

কেঁচো সারের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য গর্তের উপরে ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। তাছাড়া মাটি এবং তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে কেঁচো মারা যেতে পারে বলে কেঁচো উৎপাদনে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

পঞ্চম ধাপ: এবারে কেঁচো যে সব খাবার খায় তা গর্তে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করতে হবে। কেঁচোর খাবারের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় ঘাস, খামারজাত পদার্থ, আঁখের ও কলার ফেলে দেয়া অংশ ইত্যাদি।

ষষ্ঠ ধাপ: এই ধাপে সার তৈরি হওয়ার পর চৌবাচ্চা থেকে সতর্কতার সাথে কম্পোস্ট তুলে চালুনি দিয়ে চালতে হবে। সার আলাদা করে কেঁচোগুলো পুনরায় কম্পোস্ট তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হবে।

সপ্তম ধাপ: কেঁচো সার বাজারের চাহিদা অনুযায়ী অথবা নিজস্ব ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সাইজের প্যাকেট/বস্তা ভর্তি করে রাখা যেতে পারে।

কেঁচো সার ব্যবহারে ফসলের উপকারিতাঃ

- কেঁচো সার ব্যবহার করলে ফসলের উৎপাদন ও গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়
- এই সার ব্যবহারের ফলে চাষের খরচ কম হয়।
- সার ব্যবহারের কারণে উৎপাদিত ফসলের স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ হয় আকর্ষণীয়।
- ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়। ফলে মাটির উর্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি পায়।
- কেঁচো সার ব্যবহারের ফলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ে তাই সেচের পানি কম লাগে।
- ফসলে এই সার ব্যবহারের ফলে রোগ ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম হয়।
- জমিতে আগাছার ঝামেলা কম হয়।
- ফসলের বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে।
- অধিক কুশি, ছড়া ও দানা গঠন হয়।
- মাটির বুনট উন্নত হয়।
- রাসায়নিক সারের চাইতে খরচ অনেক কম হয় এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে।

কেঁচো সারের ব্যবহারঃ

ধান, পাট প্রভৃতি জলাবদ্ধ অবস্থায় জন্মানো ফসলে বিঘা প্রতি ৫০ কেজি কেঁচো সার শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। বৃষ্টিনির্ভর ফসল তিল, মুগ ছোলা, মাসকালাই, জোয়ার, বাজরা, সরিষা এসব কম পুষ্টি চাহিদা সম্পন্ন ফসলে রাসায়নিক সার ছাড়াই একর প্রতি মাত্র ২০০ থেকে ৩০০ কেজি কেঁচো কম্পোস্ট সার ব্যবহার করে অধিক ফলন পাওয়া যায়। সূর্যমুখী, বার্লি, ভুট্টা ও গম এসব ফসলে কৃষকরা সাধারণত হাল্কা সেচ, রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকে। এ ক্ষেত্রে একর প্রতি মাত্র ৭০০ থেকে ৮০০ কেজি কেঁচো কম্পোস্ট সার ব্যবহার করে অধিক ফলন পাওয়া যায়। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, গাজার, আলু, মিষ্টি আলু, ঢেঁড়শ, বেগুন, শসা